Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া আঈশা

রোলঃ 23090120305

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া আঈশা

রোলঃ 23090120305

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিয়া আঙ্গশা, আইডিঃ 23090120305 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সামিয়া আঈশা

আইডিঃ 23090120305

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6
পিতৃত্বের ভূমিকা: 10
মাতৃত্বের ভূমিকা: 15
আদর্শ পিতা মাতার গুণাবলী: 16
ভালোবাসা ও আন্তরিকতা: 16
নেক দুআ করা; বদ দুআ না করা: 20
মাতা পিতার দায়িত্ব ও সন্তানের হক 29
শারীরিক পরিচর্যা: 37
মানসিক পরিচর্যা: 40
ঈমানী চেতনা: 42
কথায় সত্যবাদিতা: 43
তথ্যবহি: 64

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাকে সন্তান প্রতিপালনে মাতা পিতার ভূমিকা এই টপিকের উপর থিসিস লিখার তাওফিক। আলহামদুলিল্লাহ এই উসিলায় বড় মনীষীদের মূল্যবান কিছু লেখা দেখার ও চর্চা করার সুযোগ হয়েছে। এমন বড় কিছু লেখার যোগ্যতা আমার কখনোই ছিল না এবং নেই।আল্লাহর রহমতে তা কিছুটা একত্রিত করার চেষ্টা করেছি। জানিনা এ থেকে কেউ উপকৃত হতে পারবে কিনা! আমার উদ্দেশ্য সর্বপ্রথম নিজের সংশোধন।আমার সম্মানিত উস্তাযগণের জন্য অনেক দুআ, আল্লাহ্ তায়ালা উনাদের নেক হায়াত দান করুন।যে যতটুকু সহায়তা করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তম প্রতিদান দিক। ইখলাস ছাড়া কোন আমলেরই মূল্য নেই,সেটা যত বড় আমলই হোক না কেন। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের সবাইকে এখলাসের সাথে কাজ করার তাওফিক নসিব করুন আমীন।

ইসলামে পরিবার ও পিতা-মাতার ভূমিকা:

সন্তানের সুন্দর জীবন গঠনে মায়ের ভূমিকা কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর সর্বপ্রথম মায়ের স্নেহ-ক্রোড়েই প্রতিপালিত হয়। মায়ের বক্ষনিঃসৃত শারাবান তহুরা হয় তার প্রথম খাবার। তারপর ধীরে ধীরে সে চোখ মেলতে থাকে, তার বোধহীন চোখে অনুভবের নতুন আলো ফুটতে থাকে। তখনও সে তার দুগ্ধদাত্রী স্নেহময়ী জননীকে একান্ত নির্ভরতার স্থান ও পরম প্রশান্তির ঠিকানা বলে বুঝতে শেখে। আধো আধো বুলিতে মায়ের ভাষাতেই তার মুখে প্রথম ভাষা সঞ্চার হয় এবং মায়ের কোলের পাঠশালা থেকেই তার জীবন ও জগতের পাঠ গ্রহণ আরম্ভ হয়। সন্তানের সঙ্গে এই প্রগাঢ় বন্ধনের কারণে সন্তানের লালন-পালন ও তরবিয়তের ভার স্বাভাবিকভাবে মায়ের উপরই অর্পিত হয়। যে মা তার সন্তানকে উত্তম তরবিয়তে গড়ে তুললেন, তার মাঝে ইসলামী আদর্শ ও মনুষ্যত্বের সব নমুনা প্রস্ফুটিত করে তুললেন তিনি শুধু একটি শিশুকেই নয় পরবর্তী একটি বংশকে আলোর পথের পথিক বানালেন। আজ তিনি যে শিশুটিকে উত্তম তরবিয়তে গড়ে তুলছেন ভবিষ্যতে সে-ও একদিন বাবা হবে, মা হবে, তখন সে তার সন্তানদের সে শিক্ষাই দেবে, যে শিক্ষায় সে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে যে মা এই দায়িত্ব পালনে শিথিলতা করলেন তিনি যে শুধু তার সন্তানেরই জীবন ধ্বংস করলেন তা নয়, বরং তিনি একটি বংশের ধ্বংসের বীজ বপন করলেন। এই দায়িত্বে অবহেলার কারণে কেয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ পাকের কাছে জবাবদিহিও করতে হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

“কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তাদের অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার স্ত্রী সম্পর্কে এবং নারী তার স্বামীর ঘর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।” শৈশবের এই পবিত্রতম সময়ে কোনো মা যদি তার সন্তানদের সামনে সঠিক আচার-আচরণ ও বোধ-বিশ্বাসের নমুনা উপস্থাপন করতে পারেন তাহলে হতে পারে, তার এই সন্তানই ভবিষ্যতে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর মতো সত্যের সৈনিক হবে, ইলিয়াস রহ.-এর মতো দ্বীনের দায়ী হবে কিংবা রাবেয়া বসরীর মতো তাপসী ও জ্ঞানের সাধিকা হবে। নিম্নে দু’টি বিষয়ে সম্মানিতা মায়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হল।

প্রথম বিষয় হল বাচ্চাদের খাবার-দাবার প্রসঙ্গ

অনেক মা-বাবা এদিকে তেমন নজর দেন না। ফলে পরিণতিতে সেই বাচ্চাটাও স্বভাব-চরিত্রে ভালো হয় না। হারাম খাবারের প্রভাবে সে সর্বদা মিথ্যার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। সমাজে যে লোকগুলি বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাদের অধিকাংশই শৈশবে হারাম ও সন্দেহযুক্ত খাবারে লালিত-পালিত হয়েছে। দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের কথা আমরা কে না জানি। তাঁর মহিয়সী মাতা তাঁর বাবার উপার্জনকে সন্দেহযুক্ত মনে করতেন। তাই তিনি শিশু ইকবালকে নিজের বুকের দুধের পরিবর্তে একান্ত হালাল উপার্জনে কেনা ছাগলের দুধ খাওয়াতেন। আল্লাহ পাক মায়ের এই ত্যাগকে বিফল করেননি। আল্লামা ইকবালের ব্যক্তিত্ব এত মকবুল হয়েছিল যে, তা তাঁর মায়ের আশা ও স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

পরিণত বয়সে আল্লামা ইকবাল তাঁর মায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলতেন, ‘ আমি যে জ্যাতির্ময় ঈমান ইয়াকীনের অধিকারী হয়েছি তার সবই আমার মহিয়সী মায়ের অবদান। আমি জীবনে ভালো যা কিছু অর্জন করতে পেরেছি সবই তাঁর কোলে পাওয়া তরবিয়তের সোনালী ফসল। কোনো পাঠশালা, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে অন্তর্দৃষ্টি দেয়নি এবং দেয়নি মানবতার জন্য ব্যথিত হৃদয়। আমি যা পেয়েছি তা মায়ের কোলে মায়ের শিক্ষাতেই পেয়েছি।’

এমনিভাবে ইতিহাসের পাতায় আমরা আরও যত কীর্তিমান মু’মিনের কথা পড়ি তাঁদের সবার মায়েরাই সন্তানের খাবার-দাবারে হালাল-হারাম সম্পর্কে খুবই যত্নশীল ছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয় হল ঘরের খাদেমদের সঙ্গে আচরণ

অনেক বাসাবাড়িতে কাজের লোক রাখা হয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনের সুখে-দুঃখে তারা আমাদের সঙ্গী। ঘামঝরানো শ্রম দিয়ে তারা আমাদের জীবনকে সহজ করে রাখে। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের বাচ্চারা যে ধরনের আচরণ করে থাকে তা কেবল দৃষ্টিকটু ও অশোভনই নয় রীতিমতো অমানবিক। অনেক পরিবারে আমি নিজে দেখেছি, বাচ্চারা কারণে অকারণে কাজের লোকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে, কটুবাক্য বলছে এবং সুযোগ পেলে চড়টা কিলটা খামচিটা দিতে ছাড়ছে না । মা-বাবা, বড় ভাই-বোন এবং পরিবারের অন্যান্য মুরব্বীরা এগুলোকে মোটেই গ্রাহ্য করছেন না। বাইরের কেউ এ নিয়ে কিছু বললে মা-বাবারা সন্তানদের পক্ষ সমর্থন করে বলেন, আমরা কি ওদের এসব শিখিয়ে দিচ্ছি? অবুঝ বাচ্চা, ওরা তো এসব করবেই।'

শিশুর অশোভন আচরণের প্রতি এই ছাড়ের মানসিকতা খুবই দুঃখজনক। আর এর কারণ এই যে, আমরাও ঘরের খাদেমদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করি এবং মন্দ ব্যবহারটাই তাদের প্রাপ্য বলে মনে করি। শিশুরা বড়দের আচরণ থেকে দুর্ব্যবহারের সবক গ্রহণ করে। এর বিপরীতে সে যদি তার মা—বাবা ও অন্যদেরকে সুন্দর আচরণ করতে দেখত এবং তারা যদি শিশুটির মনে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতেন তবে নিশ্চয় তার আচরণ অন্যরকম হত।

কাজের লোকদের সঙ্গে বাচ্চাদের আরেকটি আচরণ লক্ষ করা যায়। তা এই যে, পরিবারের বড় থেকে ছোট সব বাচ্চারাই, এমনকি দুই-তিন বছরের যে শিশুটির মাত্র কথা ফুটেছে, সে পর্যন্ত নিজের মায়ের বয়সী, বাবার বয়সী, বড় ভাই-বোনের বয়সী কাজের লোকদের অনায়াসে 'তুই' বলে সম্বোধন করে অথচ মা-বাবা এতে আপত্তির কিছু দেখেন না। বরং কাজের মানুষদের জন্য চাচ্চু, ফুপি, আপু, ভাইয়া ইত্যাদি কোনো ভদ্র সম্বোধনকে নিজেদের জন্য অপমানকর বলে মনে করেন। একবার এক উঁচু পরিবারে এক বাচ্চা একজন বড় কাজের মেয়েকে আপু ডেকেছিল। এ নিয়ে সে পরিবারে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। শেষে সেই মাসুম বাচ্চা, কাজের মেয়ে এবং যে তাকে আপু ডাকতে শিখিয়েছিল এই তিনজনকেই জবাবদিহি করতে হয়েছিল। অথচ এখানে মা-বাবার উচিত ছিল বাচ্চাটাকে পুরস্কৃত করা। এতে বাচ্চাটি উৎসাহিত হত এবং ভদ্রতার যে বীজ তার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হচ্ছিল তা পুষ্পিত ও পল্লবিত হত। এর সঙ্গে সেই কাজের মেয়েটির অন্তর থেকে যে দুআ আসত তা তার জীবনে সুন্দর প্রভাব ফেলত। কিন্তু এখন কী হল? বাচ্চাটির মনে যে সুকুমার বৃত্তির প্রস্ফুটন শুরু হয়েছিল

তা অঙ্কুরেই বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে হতে পারে তা আর কখনও পূর্ণরূপে বিকশিত হবে না। এভাবে তারা নিজ হাতে সন্তানের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করলেন।

কাজের লোকদের সাথে দুর্ব্যবহারের প্রবণতাটা, আমার মনে হয় ইদানিং ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী মায়েরা এ বিষয়ে এত কড়া দৃষ্টি দিতেন যে, তা আমাদের আজকের অতি আধুনিক মায়েদের কাছে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, 'শৈশবে আমার আম্মা আমার দুটি বিষয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখতেন। প্রথমত আমি যেন কখনও নামায কাযা না করি এবং দ্বিতীয়ত ঘরের কোনো কাজের লোক যেন আমার দ্বারা কষ্ট না পায়। কোনো মজলুমের আহ ধ্বনি যেন আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে অন্ধকার না করে । কখনও যদি কোনো কাজের লোকের সাথে অন্যায় আচরণ করে বসতাম তবে যত অপমানই হোক না কেন আম্মা আমাকে তার হাতে ধরে মাফ চাওয়াতেন। আম্মার এই তরবিয়তের ফলে কারও প্রতি জুলুম ও অন্যায় আচরণের প্রতি এমন ভীতি ও ঘৃণা আমার মনে জেগে উঠেছিল যে, আজ পর্যন্ত আমি কারও মনে দুঃখ দেওয়াকে কবীরা গুনাহ মনে করি এবং কখনও কোনো ভুল হয়ে গেলে তা স্বীকার করে নিতে সংকোচ বোধ করি না।" —কারওয়ানে যিন্দেগী

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ ছোটবেলায় একবার ঘরের এক খাদিমের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় তার মহিয়সী মাতা তার ঘরে যাওয়া ও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ মায়ের মারের ভয়ে খালার বাড়িতে চলে গেলেন। সেখান থেকে তিনদিন পর তার খালা তাকে সাথে করে বাড়িতে নিয়ে আসলেন এবং তার মায়ের কাছে সুপারিশ করলেন। কিন্তু মা তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন এবং বললেন যে, আহমদ চাকরের কাছে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত কোনোমতেই তাকে ক্ষমা করা হবে না। নিরুপায় বালক অবশেষে চাকরের হাত ধরে ক্ষমা চাইল এবং ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেল।

এই মহিয়সী নারী নিজেও ঘরের কাজের লোকদের সঙ্গে খুব সুন্দর ব্যবহার করতেন। তারা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজে তাদের সেবা করতেন। একবার তিনি অসুস্থ হলে তার জন্য খুব দামী ওষুধ কিনে আনা হল। ঘটনাক্রমে ওই একই রোগে ঘরের এক কাজের মেয়েও শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। তিনি তার সব ওষুধ মেয়েটিকে দিয়ে দিলেন। তার মনে বিশ্বাস ছিল যে, এই মেয়েটিকে সাহায্য করার বরকতে নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাকে ওষুধ ছাড়াই সুস্থ করে দিবেন। সত্যিই কিছুদিন পর তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

বড় দুঃখ হয় যখন দেখি, মায়েরা তাদের সন্তানদের নিয়ে বড় বড় আশা হৃদয়ে লালন করছেন, কিন্তু তাদের এই সন্তানদের হাতে ঘরের কাজের লোকেরা নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। এ যেন ঠিক আমড়া গাছ রোপন করে আপেল আশা করার মতোই হাস্যকর বিষয়। আল্লাহ আমাদের ভালো কাজের তাওফীক দান করুন।

পিতৃত্বের ভূমিকা:

একজন পিতার দায়িত্ব হল পরিবারের সদস্যদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করা এর মধ্যে রয়েছে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে খাদ্য পোশাক বাসস্থান এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা সমূহ পূরণ করা সাধারণভাবে তিনি পরিবারের সদস্যদের শারীরিক সুস্থতার জন্য দায়িত্বশীল এর মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান ও নিরাপদে রাখা অন্তর্ভুক্ত এই গুরুত্বের প্রতি অবহেলা করা যায় না।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন একজন ব্যক্তির জন্য এতটুকু গুনাহই যথেষ্ট যে, সে তাদেরকে অবহেলা করে যাদের প্রতি অর্থ খরচ করা বাধ্যতামূলক _আবু দাউদ
এই দায়িত্বের কারণে পিতা পরিবারের কর্তা এবং প্রধান ব্যক্তি ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক ব্যতীত যেভাবে কোন প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালিত করতে পারে না তেমন এভাবে পিতা পরিবারের প্রধান হিসেবে তাদের দেখবেলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন এ কারণে পরিবারের সদস্যদের কাছে আনুগত্যের হকদার এবং সকল সিদ্ধান্ত তিনি চূড়ান্ত বক্তব্য প্রদান করবেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি কোন আপোষ করবেন না বা কোন আলোচনা করবেন না বরং এর অর্থ হলো তিনি সম্মান ও আনুগত্যের যোগ্য।
মায়ের পাশাপাশি পিতাও সন্তানদের আধ্যাত্মিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক বিষয়গুলো দেখভাল করবেন। তাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন সন্তানরা যথোপযুক্ত ইসলামী শিক্ষা লাভ করে। উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সঠিক আদব- কায়দা শেখাতে তিনি তাদেরকে সহায়তা করবেন।
অর্থাৎ, প্রয়োজন অনুসারে তিনি অবশ্যই সন্তানদের পরিচর্যা, লালন- পালন ও তারবিয়া (প্রশিক্ষণ) প্রদান করবেন। অনেক পিতা এই দায়িত্বগুলোর প্রতি উদাসীন। অনেকে কেবল সন্তানদের শারীরিক প্রয়োজন তথা খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে তাদের দায়িত্ব শেষ বলে মনে

করেন! একটি পরিবারকে কার্যকর রাখতে আলোচ্য সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক।

মায়ের সাথে যেভাবে সন্তানদের মেলামেশা ও সময় কাটানো প্রয়োজন, সেভাবে পিতার সাথেও সময় কাটানো জরুরী। ছেলে শিশুদের বিকাশের জন্য এ বিষয়টি আরো বিশেষভাবে দরকার। কেননা, তাদের জন্য একটি উপযুক্ত পুরুষ রোল মডেল প্রয়োজন। সন্তানের বিকাশের জন্য সক্রিয়ভাবে পিতৃত্বের ভিত্তিতে ভূমিকা পালন করাই একজন পুরুষের মূল দায়িত্ব। সন্তান যেন বুঝতে পারে যে তাদের পিতা তাদেরকে ভালবাসেন ও যত্ন নেন। তিনি তাদের কল্যাণের কথা ভাবেন। সন্তানদের জন্য একজন মুসলিম পিতা হলেন অনুপ্রেরণাদায়ী রোল মডেল,শিক্ষক, বন্ধু এবং যে কোন প্রয়োজনে উত্তম পরামর্শদাতা।

সন্তানদের বিকাশে পিতার ভূমিকা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে।

US national institute of child health and human development কর্তৃক "সন্তানের বিকাশে পিতৃত্বের প্রভাব"- শীর্ষক একটি রিভিউতে দেখা গেছে, যে সন্তান পিতার সক্রিয় সংস্পর্শে বেড়ে ওঠে তার সামাজিক দক্ষতা অন্যদের থেকে বেশি থাকে। যখন সে নার্সারিতে পৌঁছায়, পড়ালেখায় অন্যদের থেকে ভালো করে এবং ভবিষ্যতে তার মধ্যে যে-কোন আচরণগত ত্রুটি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

সন্তানের জীবনে পিতার পরহেযগারির সুফল:

কুরআন মাজীদে কৃতজ্ঞ মুমিনের সুন্দর একটি দুআ উল্লেখ করা হয়েছে-

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰي وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নিআমত দিয়েছেন তার শোকর আদায় করতে পারি এবং এমন সৎকর্ম করতে পারি, যাতে আপনি খুশি হন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যেও সৎকর্মপরায়ণতা দান করুন। আমি আপনার কাছে তওবা করছি এবং আমি আনুগত্য প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত। -সূরা আহকাফ (৪৬) : ১৫

দুআটিতে প্রথমে তিনটি বস্তু প্রার্থনা করা হয়েছে। এরপর দুটি প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রার্থিত বস্তু তিনটি হল-

১. নিজের ও পিতামাতার প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত নিআমতের শোকরগোযারির তাওফীক।

২. আল্লাহর পছন্দসই নেক কাজের তাওফীক।

৩. সন্তানাদির মধ্যে 'সালাহ' ও সৎকর্মপরায়ণতা।

আর প্রতিজ্ঞেয় বিষয়দুটি হচ্ছে-

১. আমি তওবা করেছি এবং আল্লাহ্-অভিমুখী হয়েছি।

২. আমি আল্লাহর আনুগত্যকারী।

এখানে সন্তানের ইসলাহ ও সংশোধন কামনার আগে নিজে কৃতজ্ঞ মুমিন হওয়া এবং আল্লাহর ইবাদতগোযার বান্দা হওয়ার তাওফীক চাওয়া হয়েছে এবং সন্তানের 'সালাহ' ও সৎকর্মপরায়ণতা কামনার পর নিজের আল্লাহমুখী হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্য করার অঙ্গিকার করা হয়েছে। অর্থাৎ সন্তানের 'সালাহ' ও 'ফালাহ' (সাধুতা ও সফলতা) প্রার্থনা করার আগে ও পরে নিজের সাধুতা ও ধার্মিকতা প্রকাশ করা হয়েছে। এখান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সন্তানের ফালাহ ও সালাহের ক্ষেত্রে পিতার আমলের অনেক প্রভাব রয়েছে। পিতার সালাহ, শোকরগোযারি, তওবা ও আনুগত্যের দ্বারা সন্তান অনেক উপকৃত হয়। এর মাধ্যমে সন্তানের জীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আরো খুশির ব্যাপার হল- সেই কল্যাণ কেবল দ্বীনী বিষয়ে নয়; বরং পার্থিব জীবনেও প্রকাশ পায়।

পিতার ঈমান-আমল-এখলাছের সুফল দুনিয়ার জীবনেই লাভ হয়। এর কল্যাণে সন্তানের জীবনে স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়। আলকুরআনেই রয়েছে এর সত্যায়ন।

কুরআন মাজীদে খাযির আলাইহিস সালাম ও মূসা আলাইহিস সালামের সফর ও কথোপকথন সংক্রান্ত একটি শিক্ষণীয় ঘটনা বিবৃত হয়েছে। সেখানে এসেছে, পথিমধ্যে তাঁরা দেখেছেন, একটা প্রাচীর পতনোম্মুখ। হেলে আছে, পড়ে যায় যায়। আল্লাহ তাআলা খাযির আলাইহিস সালামের মাধ্যমে প্রাচীরটাকে দাঁড় করিয়েছেন। পতন থেকে রক্ষা করেছেন। প্রাচীরটি ছিল

দুই এতীম শিশুর। প্রাচীরকে কেন হেফাযত করা হল? এর জবাব শুনুন খাযির আলাইহিস সালামের যবানে। কুরআনের ভাষায়-

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّك.

আর প্রাচীরটি; এটি ছিল এই শহরে বসবাসকারী দুই এতীমের। এর নিচে তাদের গুপ্তধন ছিল এবং তাদের পিতা ছিলেন একজন সৎলোক। সুতরাং আপনার প্রতিপালক চাইলেন, ছেলেদুটো প্রাপ্তবয়সে উপনীত হোক এবং নিজেদের গুপ্তধন বের করে নিক। এসব আপনার প্রতিপালকের রহমতেই ঘটেছে। -সূরা কাহফ (১৮) : ৮২

আয়াতটিতে বলা হয়েছে, এতীম শিশুদ্বয়ের পতনোম্মুখ প্রাচীরকে পতন থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন তাদের পিতা মহোদয়ের সালাহ ও ধার্মিকতার বরকতে। সুতরাং বোঝা যায়, সন্তান পিতার তাকওয়া ও দ্বীনদারির সুফল দুনিয়াতেই লাভ করতে থাকে। এর বদৌলতে সন্তানের জীবন সুখময় ও শান্তিময় হয়। খ্যাতিমান তাবেয়ী, খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনে আবদুল আযীয রাহ. বলেন-

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ إِلَّا حَفِظَهُ اللهُ فِي عَقِبِه وَعَقِبِ عَقِبِه.

কোনো সৎলোক মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাঁর সন্তানাদি ও পরের প্রজন্মের হেফাযত করেন। -আলই'তিবার, ইবনে আবিদ্ দুনইয়া, বর্ণনা ৭১; তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির ৩১/২২২; জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম ১/৪৬৭

সুতরাং আমি যদি সন্তানের কল্যাণ কামনা করি, কলিজার টুকরোকে ফুল ও আলো হিসেবে দেখতে চাই, সর্বোপরি প্রিয় সন্তানের ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-শান্তি এবং স্বস্তি ও সফলতার প্রত্যাশী হই, তাহলে প্রথমে আমার নিজের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। নিজেকে শোধরাতে হবে। আমার জীবনকে তাকওয়া ও পরহেযগারিতে সজ্জিত করতে হবে। আমার সালাহ ও ধার্মিকতার মাধ্যমে আমার সন্তান দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সালাহ ও ফালাহ অর্জনে এগিয়ে যাবে।

মশহুর তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাহ. বলেন-

إِنَّ اللهَ لَيُصْلِحُ بِصَلَاحِ الْعَبْدِ وَلَدَه، وَوَلَدَ وَلَدِه، وَيَحْفَظُه فِي دُوَيْرَتِه، وَالدُّوَيْرَاتِ الَّتِي حَوْلَه مَا دَامَ فِيهِمْ

ব্যক্তির 'সালাহ' ও ধার্মিকতার কল্যাণে আল্লাহ তাআলা তার সন্তানাদি ও তাদের পরের প্রজন্মকে 'সালাহ' ও ধার্মিকতা দান করেন এবং তার ঘরবাড়ি ও তার আশপাশের ঘরবাড়ির হেফাযত করেন, যতক্ষণ সে তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। -সুনানে কুবরা, নাসায়ী, বর্ণনা ১১৮৬৬; আয্যুহ্দ ওয়া রাকাইক, ইবনুল মুবারক, বর্ণনা ৩৩০

তাই সন্তানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য কোনো কোনো মনীষী নামাযের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহ. একবার তাঁর ছেলেকে লক্ষ করে বলেছেন-

لأزيدن في صلاتي من أجلك،رجاء أن أُحْفَظَ فيك.

তোমাকে আল্লাহ হেফাযত করবেন- এ আশায় আমি নামাযের পরিমাণ বাড়িয়ে দিই। -জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম ১/৪৬৭

সুতরাং সন্তানকে আদর্শ ও আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করব। উল্লিখিত আয়াতের বার্তা গ্রহণ করব এবং সে আলোকে নিজের জীবন পরিচালনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। সাথে দুআটি বেশি বেশি পড়ব-

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰي وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নিআমত দিয়েছেন তার শোকর আদায় করতে পারি এবং এমন সৎকর্ম করতে পারি, যাতে আপনি খুশি হন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যেও সৎকর্মপরায়ণতা দান করুন। আমি আপনার কাছে তওবা করছি এবং আমি আনুগত্য প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত। -সূরা আহকাফ (৪৬) : ১৫

মাতৃত্বের ভূমিকা:

ইসলামিক ইসলামিক দৃষ্টিতে মাতৃত্ব অত্যন্ত সম্মানজনক একটি দায়িত্ব। এর মাধ্যমে একজন নারী প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পুরস্কার লাভ করতে পারে।

নবীজির একটি সুপরিচিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! 'আমার কাছ থেকে সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' সে বলল, 'অতঃপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার বাবা।'

—বুখারী ও মুসলিম

এই হাদিসের মাধ্যমে মাতৃত্বের গুরুদায়িত্বের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। দুনিয়াতে সবচেয়ে মূল্যবান ও দামি কাজ হল মায়ের ভূমিকা পালন করা। কেননা, একজন মায়ের হাতেই পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে ওঠে। এভাবে একজন মা একটি মজবুত সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। সন্তানের যত্ন নেওয়া, তাকে বড় করা, বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া ও সন্তানের জীবনের নানান দিক- নির্দেশনা দিয়েই একজন মায়ের জীবনটা কেটে যায়। এ কারণে মায়ের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি- যার তিনি যোগ্য দাবিদার।

এই দায়িত্বগুলো আল্লাহ তার অসীম রহমত ও হিকমাহ অনুসারে নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন একশটি রহমতও সৃষ্টি করেন। প্রতিটি রহমতই আসমান ও জমিনের মাঝখানে মহাশূন্যের মতো বড়। তন্মধ্যে একটি রহমত তিনি পৃথিবীতে দিয়েছেন। এরই অংশ হিসেবে মা তার সন্তানকে স্নেহ করে...—বুখারী

এ কারণে আল্লাহ নারীদেরকে কিছু অনন্য গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে ভূষিত করেছেন যার মাধ্যমে সে সফলতার সাথে মাতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে। নারীরও সৃষ্টিগতভাবেই অধিক যত্নশীল, মমতাময়, সংবেদনশীল এবং ধৈর্যশীল হয়ে থাকে। এ- সকল চারিত্রিক গুণের মাধ্যমে একটি উষ্ণ, প্রেমময় শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয় সমস্ত ঘর জুড়ে!

মাতৃত্ব একটি ফুলটাইম ক্যারিয়ার। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা, সন্তান জন্মদান, সন্তানকে দুধ পান করানো, শৈশবের বছরগুলোতে তাকে কোলে- পিঠে মানুষ করা– সবকিছুই মাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই দায়িত্বগুলোই একজন ব্যক্তির জন্য অনেক। কিন্তু এর সাথে যদি পরিবারের আর্থিক জোগানোর কাজটাও সেই মায়ের উপর বর্তায়, তাহলে এটি একটি অতিরিক্ত বোঝা। তাই বাড়ির বাইরে গিয়ে অর্থ উপার্জন করার দায়িত্বটা আল্লাহ পুরুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন, নারীর জন্য নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রহমত। কেননা,যদি এই বোঝা তার উপর

চাপিয়ে দেওয়া হতো তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা তারা সহ্য করতে পারত না। সাধারণ পরিস্থিতিতে নারীরা ঘরে কাজ করার মাধ্যমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বগুলো আদায় করতে পারে।

আদর্শ পিতা মাতার গুণাবলী:

আদর্শ পিতা-মাতার গুণাবলি মূলত ভালোবাসা, আন্তরিকতা দয়া, দো'আ, ধৈর্য ও নৈতিক নেতৃত্বের সমন্বয়। তাঁরা সন্তানকে শুধু নিজের উত্তরাধিকার হিসেবে নয়, বরং আল্লাহর আমানত হিসেবে দেখেন। পিতা-মাতার এ গুণগুলো সন্তানকে দ্বীন ও নৈতিকতার পথে রাখে, যা ইসলামী সমাজের ভিত্তিকে দৃঢ় করে, পবিত্র কুরআনে যেমন আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের গুন উল্লেখ করেছেন তেমনি আদর্শ পিতা মাতা হওয়ার জন্যও থাকা চাই কিছু গুন ও বৈশিষ্ট্য।

ভালোবাসা ও আন্তরিকতা:

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা যখন আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করি চাই সেটা সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অথবা শাসনের ক্ষেত্রেই হোক না কেন তখন আমরা দেখতে পাই তার পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয়, এবং তার প্রতিটি কাজ কর্মই ছিলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত, সুতরাং আমরা খেয়াল রাখবো শিশুদের প্রতি আমাদের আচরণ কখনোই যেন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে না চলে যায়,পিতা মাতার উচিত শিশুদের বুঝতে দেওয়া যে, তারা তাদের কত ভালোবাসেন এবং কত যত্ন নেন! প্রতিনিয়ত পিতা মাতার উচিত সন্তানকে জানানো যে আমরা তোমাদেরকে ভালোবাসি। শিশুদের সাথে ভদ্রতা বজায় রেখে সম্মান ও সৌজন্যবোধ বজায় রেখে আচরণ করতে হবে। কেননা মুখের কথার থেকে কাজ অনেক বেশি শক্তিশালী। শিশুকে স্পর্শ করা, চুমু খাওয়া, কোলে নেওয়া, জড়িয়ে ধরা, মাথায় হাত বুলানো কিংবা উৎসাহ দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا»

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ লোকদের সহিত সহজ ও সরল ব্যবহার কর, কষ্টদায়ক ব্যবহার করিও না। তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান কর; বীতশ্রদ্ধ করিও না। মোত্তাঃ

—মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৩৭২৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদাহরণ হতে আমরা দেখতে পাই তিনি সবসময় শিশুদের প্রতি সদয়, কমল, শ্রদ্ধাশীল, এবং মমতাময় ছিলেন। তিনি শিশুদেরকে অনেক ভালবাসতেন। পথে ঘাটে দেখা হলে তিনি প্রথমে শিশুদের কে সালাম দিতেন। তাদের সাথে খেলা করতেন মজা করতেন। নিজের নাতি হাসান এবং হুসাইনকে পিঠের উপর চড়াতেন, তাদেরকে কোলে তুলে নিতেন, চুমু খেতেন।

একদা হযরত আকরা ইবনে হারেস রাঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন তিনি শিশু ইমাম হাসানকে আদর করছেন আকরা আরজ করলেন আমার দশটি সন্তান আছে আমি তাদের মধ্যে কাউকে আদর করিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন.

من لا يرحم لا يرحم

অর্থাৎ “যে দয়া করে না তার প্রতি দয়া করা হয় না”

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَال حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

আবু বিশর বকর ইবন খালাফ ও মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া (রাহঃ)...... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) সূত্রে নবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি (ﷺ) বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চাইতে আমার পরিবারের কাছে উত্তম।

–আত তারগীব ওয়াত তারহিব)

-وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا أعطي أهل بَيت الرِّفْق إِلَّا نفعهم

হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোমলতা রয়েছে, সে পরিবার উপকৃত হয়।

—আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব)

উম্মু খলিদ বিনতু খলিদ ইবনু সাইদ থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন আমি আমার পিতার সাথে রাসুল ﷺ র কাছে এলাম। আমার গায়ে তখন হলুদ রঙের জামা ছিল। রাসূল বললেন সানাহ সানাহ। আব্দুল্লাহ রহমান উল্লাহ বলেন, হাবশী ভাষায় সানাহ অর্থ সুন্দর, সুন্দর ।
উম্মু খলিদ বলেন, আমি তখন মোহরে নবুয়ত নিয়ে খেলতে লাগলাম, আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, ও যা করছে করতে দাও।
এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বললেন, তোমার কাপড় পুরনো করো ও জীর্ণ করো; আবার পুরনো করো, জীর্ণ করো; আবার পুরনো করো, জীর্ণ করো। তিনবার বললেন। আল্লাহ রহমাতুল্লাহ বলেন তিনি অনেক দীর্ঘ জীবন লাভকারী হিসেবে আলোচিত হয়েছিলেন।

সাহল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেউ যেন কোন মজলিসে কোন ব্যক্তি ও তার বাচ্চার মাঝখানে গিয়ে না বসে।

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি দশটি বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কক্ষনো আমার প্রতি উ: শব্দটি করেননি। একথা জিজ্ঞাসা করেননি, তুমি এ কাজ কেন করলে এবং কেন করলে না?

আব্দুল্লাহ ইবনে হাদিস থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ আব্দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ,ও কাসীরকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করাতেন আর বলতেন, যে দৌড়ে আমার কাছে আগে আসতে পারবে, সে অমুক অমুক জিনিস পাবে। তারা দৌড়ে তার কাছে এসে তার বুকে পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাসূল ﷺ তাদেরকে জড়িয়ে নিলেন এবং চুমু দিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন: একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়াচ্ছিলেন এমন সময় হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আগমন করলেন এবং তার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে গেলেন। তিনি সেজদায় অনেক বিলম্ব করলেন; এমন কি,নামাযীরা মনে করলো, হয়তো আজ কোন নতুন ব্যাপার ঘটেছে।নামাযান্তে মুসল্লিরা আরজ করলো:আপনি দীর্ঘ সেজদা করেছেন। ফলে আমরা নতুন কিছু ঘটেছে বলে ধারণা করলাম। তিনি বললেন আমার সন্তান আমার উপর সওয়ার হয়ে গিয়েছিল ,তাই তার ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে দেয়া ভালো মনে করিনি ।
এতে কয়েকটি উপকারীতা পাওয়া গেল- প্রথম, আল্লাহর নৈকট্য, যা সেজদা অবস্থায় অধিক সময় কাটলো। দ্বিতীয়, সন্তানের প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পা প্রকাশ পেল। তৃতীয়, উম্মতকে দয়া শিক্ষা দেওয়া হলো।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে: সন্তানের সুগন্ধি জান্নাতের সুগন্ধি সদৃশ।

- হযরত আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আহনাফ ইবনে কায়েস কে তলব করে বললেন: সন্তান সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন: আমিরুল মুমিনিন, সন্তানরা আমাদের অন্তরের ফল এবং পিঠের বালিশ। আমরা তাদের জন্য অনুগত পৃথিবী ও ছায়াবিবিশিষ্ট্য আকাশ। তাদের জন্যই আমরা বড় বড় বিপদে ঢুকে পড়ি। তারা কিছু চাইলে দেবেন, রাগ করলে আদর করে তুষ্ট করবেন, তখন তারা মনে প্রানে আপনাকে ভালোবাসবে। আপনি তাদের প্রতি কঠোর হবেন না। তাহলে আপনার প্রতি অতিষ্ট হয়ে তারা আপনার দ্রুত মৃত্যু কামনা করবে।আমির মুয়াবিয়া বললেন: আহনাফ,আল্লাহর কসম, তোমার আগমনের পূর্বে আমি ইয়াজিদের প্রতি ভীষণ রাগান্বিত ছিলাম। আহনাফ চলে গেলে আমির মুয়াবিয়া ইয়াজিদের প্রতি প্রসন্ন হলেন এবং দু লাখ দিরহাম ও দু'শ থান তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ইয়াজিদ এ থেকে অর্ধেক আহনাফকে দিয়ে দিলো।

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন খুব বড় দরজার সাহাবী। হযরত আলী ও হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পর তিনি ছিলেন মুসলিম জাহানের খলিফা। সে সময়ের ঘটনা।

একলোক হযরত মুয়াবিয়া (রদি.) এর ঘরে গিয়ে দেখেন অদ্ভুত দৃশ্য! একটি শিশু খলিফার গলায় রশি লাগিয়ে টানছে, আর খলিফা হাম্বা হাম্বা করে চার হাত পায়ে শিশুটির পিছনে পিছনে চলছেন। তাতে শিশুটি খিলখিলিয়ে হাসছে। লোকটি অবাক হয়ে বলল –

খলিফাতুল মুসলিমীন!

আপনার এমন কান্ড!

হযরত মুয়াবিয়া (রদি.) লোকটিকে ধমক দিয়ে বললেন–

চুপ করো, শিশুদের আদর করা, আনন্দ দেওয়া আমরা আল্লাহর নবীর কাছ থেকে শিখেছি। তিনি আমাদের বলেছেন– শিশুদের সঙ্গে তোমরা শিশু হয়ে খেলা করবে যাতে শিশুরা আনন্দ পায়।

বলপ্রয়োগ করা ও দক্ষতার মাধ্যমে তারবিয়ত কোন উত্তম পদ্ধতি নয়। এমনটি যদি হতো,তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে দুর্বল প্রমাণিত হতেন। কারণ, তরবিয়তের ক্ষেত্রে তার পুরোটা যিন্দেগিই ছিল কোমলতা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। অতএব, সন্তানদেরকে মহাব্বত ও ভালোবাসা, কোমলতার সাথে তরবিয়ত দিন। মনে রাখবেন, এখন আপনি সবল, একদিন আপনি বুড়ো হবেন, দুর্বল হবেন। আপনার ছোট ছোট

সন্তানরাও একদিন বড় হবে, সবল হবে। ইন শা আল্লাহ্ আপনি যদি শৈশবেই তাদের অন্তরে মহব্বত ও ভালবাসার বীজ বপন করতে পারেন, তাহলে আপনার বৃদ্ধ বয়সে আপনিই সর্বপ্রথম তার সুফল ভোগ করবেন।

নেক দুআ করা; বদ দুআ না করা:

ইসলামে পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো সন্তানের জন্য নেক দো'আ করা। কুরআন ও হাদীসে দেখা যায়—সন্তানের কল্যাণে পিতা-মাতার দো'আ অত্যন্ত দ্রুত কবুল হয়। তাই ইসলাম অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়েছে যেন তারা সন্তানের জন্য বরকতময়, কল্যাণকর ও হেদায়েতের দো'আ করে; আর কোনো অবস্থাতেই বদ দো'আ না করে।

নেক দো'আর গুরুত্ব

পিতা-মাতার দো'আ সন্তানের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে হযরত ইবরাহীম ও হযরত জাকারিয়্যাহ আলাইহিমুস সালামের দো'আর কথা উল্লেখ করেছেন—

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে নেক সন্তান দান করুন।"
(সূরা আস-সাফ্ফাত: ১০০)

আরেক আয়াতে—

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এবং আমার সন্তানদের নামাযের প্রতিষ্ঠাকারী বানান।"
(সূরা ইবরাহীম: ৪০)

এ থেকে বোঝা যায়—আদর্শ পিতা সর্বপ্রথম সন্তানের হেদায়েত, ঈমান ও আমল নিয়ে দো'আ করে।

নবী ﷺ-এর শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ... وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ

“তিনটি দো‘আ সন্দেহাতীতভাবে কবুল হয়... তার একটি হলো পিতা-মাতার সন্তানের জন্য করা দো‘আ।”
(তিরমিযী)

অর্থাৎ, পিতা-মাতার দো‘আ সন্তানের জন্য রহমতের দরজা খুলে দেয়। তাই প্রতিদিন সন্তানের জন্য দো‘আ করা মা-বাবার দায়িত্বের অংশ।

সন্তানের ব্যাপারে মায়ের দুআ কবুল হয়

মুফাককিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রাহিমাহুল্লাহর-নাম আমরা কে না শুনেছি? আল্লাহ তায়ালা মহান এ মনীষী থেকে দ্বীনের যে পরিমাণ কাজ নিয়েছেন; ইসলামী ইতিহাসের নিকটতম অতীতে যার নজির খুঁজে পাওয়া বড় মুশকিল। আল্লাহ তাআলা তাকে অসাধারন গ্রহণযোগ্যতা ও মকবুলিয়্যাত দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার মকবুল ও মাহবুব বান্দা ছিলেন; এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। শুক্রবার দিন, রোজা অবস্থায়, জুমার নামাজের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সুরা ‘ইয়াসিন’ তেলাওয়াতরত অবস্থায় তার আত্মা এ ধরাধাম ত্যাগ করে পরজগতে গমন করে। পৃথিবীর প্রায় সকল বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে তার গায়েবানা জানাজা আদায় করা হয়। রমজান মাসের ২৭ তম রাতে মসজিদে নববী ও মক্কা শরীফে সাতাশ লাখের চেয়েও বেশী উপস্থিত মুসল্লিগণ তার গায়েবানা জানাজা আদায় করেন এবং তার মাগফিরাত ও উঁচু মর্যাদার জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তাআলার কাছে এমন প্রিয় ও গ্রহণীয় খুব কম বান্দাদেরই জোটে।

নদভী রাহিমাহুল্লাহ ছেলেবেলায় খুব মেধাবী ছিলেন না। চতুরও ছিলেন না। মাদরাসায় তার ইলমি যোগ্যতা স্বাভাবিক এবং মধ্যম মানের একজন তালেবে ইলমের মত ছিল। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তার থেকে যে পরিমাণ দ্বীনের কাজ নিয়েছেন তা খুবই বিস্ময়কর। নদবী রহিমাহুল্লাহকে যখন আল্লাহ প্রদত্ত কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো; তখনতিনি বলতেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমার তাকদীরে যে দ্বীনি খেদমত জুটেছে তার পেছনে আমার সম্মানিত মায়ের দোয়ার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। মূলত: আমার সব অর্জন তার সে দোয়ার বরকতেই হয়েছে। নদভী রাহিমাহুল্লাহ র মাতা বড় ইবাদতগুজার, পরহেজগার, ও জিকিরকারিণী ছিলেন । ৯৩ বছর বয়সে তিনি

ইন্তেকাল করেন। তিনি তার মৃত্যু অবধি দৈনিক দু'রাকাত 'সালাতুল হাজত' পড়ে তার এ ছেলের জন্য দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমার চোখের মনি আলী থেকে যেন কোন মন্দ কাজ না হয়। জীবনের প্রতিটি বাঁকে হে আল্লাহ! তুমিই তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো। তিনি তার এ ছেলেকে ওসীয়ত করেছিলেন, আলী! তুমি তোমার কর্ম তালিকায় এ দোয়াটিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিও—

اللهم اتني بفضلك افضل ما تؤتي عبادك الصالحين

'হে আল্লা!হ তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে যা দাও, মেহেরবানী করে আমাকে তার শ্রেষ্ঠ অংশ দান কর।'

নদভী রহিমাহুল্লাহর 'মা' তার জন্মের পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই মৃত্যুর পূর্বে দেখে যান। স্বপ্নে দেখেছিলেন, এক অদৃশ্য আওয়াজকারী তার যবানে কুরআনের এই আয়াত জারি করে দিয়েছেন যে, 'আমরা তোমার চোখের শীতলতার জন্য যে গুপ্তধন গোপন রেখেছি সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারনা নেই।'সূরা সিজদা, আয়াত -১৭)

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

নদভী রহিমাহুল্লাহকে তার মা এভাবে প্রতিপালন করেছিলেন যে, যদি তিনি কোন কাজের লোক বা বুয়ার ছেলে সন্তানের উপর জুলুম করতেন, তাহলে তাদের থেকে শুধু ক্ষমাই চাইতে বলতেন না, বরং তাদের থেকে মারও খাওয়াতেন। ফলাফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, ছেলেবেলা থেকেই জুলুম-নির্যাতন অহংকার ও আতম্ভরিতার প্রতি নদভী রহিমাহুল্লাহ এর ঘৃণা জন্মে ছিল। এবং কারো মনে কষ্ট দেওয়ার প্রতি তার ভয় জন্মেছিল। এশার নামাজ না পড়ে যদি শুয়ে পড়তেন তবে মা তাকে উঠিয়ে নামাজ পড়িয়ে নিতেন। ফজরের নামাজ জামাতে পড়ার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ফজরের পর তিলাওয়াত ছুটতে দিতেন না।

উপরোক্ত ঘটনার আলোকে আমরা যদি আমাদের অবস্থার জরিপ চালাই তাহলে হয়তো আমাদের শতকরা দু'জন বাবা-মাকে সে অনুযায়ী পাওয়া যাবে। 'সালাতুল হাজত' পড়ে সন্তানের জন্য দোয়া করা তো দূরের কথা সারা জীবনে একবারও হয়তো আমরা সালাতুল হাজত পড়ে সন্তানের উন্নতি-কল্যাণ ও সংশোধনের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করিনি। অথচ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা-ই আমাদের সন্তানদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য দোয়া করার পদ্ধতি পর্যন্ত শিখিয়ে দিয়েছেন এবং তার আদবও বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– তোমরা তোমাদের সন্তানের জন্য আমার থেকে এভাবে চাও,

ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান দান কর যারা আমাদের চোখ শীতল করবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।' সূরা ফুরকন, আয়াত -৭৪)

বদ দো'আর নিষেধাজ্ঞা

ইসলামে সন্তানের উপর বিরক্ত হয়ে বদ দো'আ করা কঠোরভাবে নিষেধ। রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَوْلَادِكُمْ

"নিজেদের বিরুদ্ধে এবং সন্তানদের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করো না।"
(মুসলিম)

কারণ, কখনও কখনও এমন সময় বদ দো'আ উচ্চারিত হতে পারে—
যেই মুহূর্ত আল্লাহর কাছে কবুলের সময় হতে পারে এবং তা সন্তানের জীবনে অপকারী প্রভাব ফেলতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, নিজের উপর, নিজের সন্তানের উপর এমনকি নিজের মাল-সম্পদ ও খাদেমদের উপর বদ দোয়া করো না। হয়তো তোমার এই দোয়া কোন খাস কবুলিয়াতের সময়ে হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে ।

এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহি:) এর কাছে নিজের পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি বললেন: তুমি কখনো তাকে বদদোয়া করেছ কি? সে বলল: হাঁ। তিনি বললেন: তাহলে তুমি নিজেই তাকে নষ্ট করেছ। এখন আর কি প্রতিকার! সন্তানের প্রতি দয়া ও নম্রতা করা মুস্তাহাব।

অন্যের সন্তানকে খারাপ বলার কুফল

ইসমাইল সাহেব যদিও আলেম ছিলেন না, কিন্তু অত্যন্ত ধর্মভীরু, তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন এবং নিয়মিত জামাতে প্রথম তাকবীরের সঙ্গে নামাজ আদায়ের সচেষ্ট ছিলেন। তার সর্বমোট ছয় জন সন্তান ছিলো। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি যে পরিমাণ কষ্টকর অস্থিরতা ও যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন, তা ছিলো তার সন্তানদের জন্য প্রচন্ড দুশ্চিন্তা। তার তিনজন সন্তানের বিয়ে হয়েছিল। বাকি ছেলেরা ছিল এখনও অবিবাহিত। এদের মধ্যে ছোট দুই ছেলে তার জন্য দুর্নামের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা অযোগ্য ও দুষ্টু প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলো। পুরো মহল্লা ও এলাকার লোকজন তাদের কারণে অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এদের কারণে অন্য ছেলেরাও দুর্নামের ভাগীদার হয়ে গিয়েছিল।

বাবা ইসমাইল মৃত্যু পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন— হে আল্লাহ, আমার মনে পড়ছে না, আমি জীবনে এমন কি পাপ করেছি, যার কারণে আমাকে আজ এমন দুর্দিন দেখতে হচ্ছে।

তার সমবয়সীরাও বলছিলো যে, তিনি ছেলেবেলা থেকেই সজ্জন ও ভালো মানুষ ছিলেন। সব সময় হারাম- হালাল বাছবিচার করে চলতেন। কখনো মাদক, ব্যভিচার, ও জুয়াবাজির ধারে কাছেও যাননি। একদিকে এমনই ছিল তার ইতিবাচক অবস্থা, আর অন্যদিকে তার সন্তানদের নেতিবাচক পরিস্থিতি। সমস্যার সমাধান হচ্ছিলো না– কিছু মানুষ তার ব্যাপারে গভীর পর্যবেক্ষণ করলেন। এক্ষেত্রে সমকালীন এক বুজুর্গ সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন এবং বিষয়টি অল্প সময়ে বোঝা গেল। তার বুজুর্গ সঙ্গীর বক্তব্য ছিল–যৌবনকালে মসজিদে যাওয়ার সময় যখন দুষ্টু ছেলেরা তার সামনে পড়তো, তখন তিনি ধিক্কার দিতেন যে, তোমরা কোন বদমাশ বাবার সন্তান? তোমাদের বাবা কি হারাম রোজগার করে আর সেগুলো তোমাদের খাওয়ায়? যার কারণে তোমাদের এই দুরবস্থা হয়েছে? স্বজনদের কারো কোন নেতিবাচক, অপছন্দনীয় অবিশ্বাসযোগ্য কথা যদি তার কানে আসতো, তবে তিনি সবার সামনে মন্তব্য করতেন যে, ইতরদের সন্তান ইতরই হয়ে থাকে। এই ছেলেদের বাবাও যুবক থাকতে এমন কোন কাজ করে থাকবে। এজন্যই তার ছেলেদের এই অবস্থা হয়েছে।

মোটকথা, কাউকে ধিক্কার দেওয়া এবং কারও পাপের কারণে তাকে লজ্জা দেওয়ার ক্ষেত্রে তার জুড়ি মেলা ভার ছিলো। এই কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মনে পড়ে গেল—কোন ব্যক্তি কাউকে যদি তার পাপের কারণে লজ্জা দেয়, তবে মৃত্যুর পূর্বে নিজেই সেই পাপে জড়িয়ে পড়বে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেছেন, কারোও বিপদে খুশি না হলে আল্লাহ তায়ালা তার দোষ গোপন রাখবেন।

আমাদের এই কথাটি বেশ ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত যে, সন্তানদের এই মন্দ পরিণতি যুবক বয়সে তার মন্দভাষণ ও অন্যদের ধিক্কার দেওয়ার ফল হতে পারে।তার সেই বুজুর্গ বন্ধু এটাও বলেন– নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কঠোর আচরণ করতেন। তাদের কোন অযাচিত কাজ তিনি কিছুতেই সহ্য করতেন না। ধমকেতেন, মারতেন এবং কখনো ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের ইবলিস, শয়তান, অভিশপ্ত ও মরদুদ(ধর্মত্যাগী) ইত্যাদিও বলতেন। হতে পারে, তা তক্ষুনি আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হয়ে গেছে। এজন্যই হয়তোবা আল্লাহ তাআলা তার সন্তানদের শয়তানের বৈশিষ্ট্যধারী বানিয়ে দিয়েছেন। কেননা, সন্তানদের ব্যাপারে মা বাবার দোয়া যেভাবে দ্রুত কবুল হয়, একইভাবে বাবা-মার বদদোয়াও সন্তানদের বেলায় দ্রুত কার্যকর হতে দেখা যায়। তাই কখনো মনের ভুলেও, রাগে ও উত্তেজিত হয়ে নিজের সন্তানদের ধমকানোর ক্ষেত্রে খারাপ নামে ডাকা উচিত নয়। এমনও হতে পারে সেটাই কবুল হওয়ার সময় এবং তার প্রভাব প্রকাশ পেয়ে যাবে।

তিনি যদি তার সন্তানদের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নির্দেশিত নীতিমালা পালন ও দোয়া প্রার্থনার মাধ্যমে নিজের সন্তানদের প্রতিপালন করতেন এবং অন্য কারো সন্তানকে খারাপ না বলতেন, সম্ভবত তাহলে এমন দূর্দিন তাকে দেখতে হতো না। আল্লাহর কাছে আমাদের

প্রার্থনা করা উচিত হে আল্লাহ আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন যারা আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা বয়ে আনবে এবং আমাদের আল্লাহভীরুদের নেতা বানান।

কেন বদ দো'আ করা নিষিদ্ধ?

১. সন্তান ভুল করলে তা সংশোধনের সুযোগ আছে, কিন্তু বদ দো'আ তাকে আরো নষ্ট করতে পারে।
২. বদ দো'আ পিতা-মাতা–সন্তানের সম্পর্ককে দুর্বল করে।
৩. আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার কথাকে সম্মানিত করেন—তাই তাদের অভিশাপ বা রাগী মন্তব্যও ক্ষতির কারণ হতে পারে।
৪. বদ দো'আ থেকে রাগ, হতাশা ও ক্রোধের পরিবেশ তৈরি হয়, যা ইসলামী পরিবার কাঠামোর বিপরীত।

পিতা-মাতার করণীয়

*সন্তানের ভুল হলে ধৈর্য ধরে সংশোধন করা

*রাগের সময় চুপ থাকা

*প্রতিদিন সন্তানের জন্য নেক দো'আ করা

*দো'আর মধ্যে হেদায়েত, ঈমান, চরিত্র, রিজিক, স্বাস্থ্য, নেক আমল অন্তর্ভুক্ত করা।

সমালোচনা গ্রহন করার মানসিকতা:

ইসলামে আদর্শ পিতা-মাতার একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো সমালোচনা গ্রহণ করার মানসিকতা। সন্তানের ভুল ধরিয়ে দেওয়া যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি সন্তান, পরিবারের অন্যান্য সদস্য কিংবা সমাজ থেকে পাওয়া গঠনমূলক পরামর্শকে বিনয় ও ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করাও অভিভাবকের জন্য অপরিহার্য। কারণ পরিবার পরিচালনায় একতরফা সিদ্ধান্ত ও গোঁড়ামি সংঘাত বাড়ায়, আর বিনয়, পরামর্শ ও আত্মসমালোচনা পারিবারিক শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।

১. আত্মসমালোচনার গুরুত্ব—কুরআনের দৃষ্টিতে

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলেছেন—

﴿وَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه

"তারা কথা শোনে এবং উত্তমটাকে গ্রহণ করে।"
(সূরা আয-যুমার: ১৮)

এই আয়াত স্পষ্ট নির্দেশ করে যে মানুষকে শোনার অভ্যাস, উপকারী পরামর্শ গ্রহণ এবং নিজেকে সংশোধন করার মানসিকতা রাখতে হবে। পিতা-মাতাও এর অন্তর্ভুক্ত।

২. নবী ﷺ-এর আদর্শ

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ছিলেন সবচেয়ে বড় নেতা, শিক্ষক ও অভিভাবক। তবুও তিনি সমালোচনা বা পরামর্শকে কখনো অপমান মনে করেননি; বরং শান্তভাবে শুনে উত্তম পথ গ্রহণ করেছেন।

নবী ﷺ বলেছেন—

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ

"দ্বীন হলো উপদেশ।"
(মুসলিম)

অর্থাৎ, উপদেশ গ্রহণ করা দ্বীনের অংশ; এবং পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করা অহংকারের লক্ষণ।

৩. সন্তানের কাছ থেকেও পরামর্শ গ্রহণের মানসিকতা

সন্তানরা ছোট হলেও তাদের অনুভূতি, মতামত, কষ্ট বা অভিযোগের মূল্য আছে।
আদর্শ পিতা-মাতা—

*সন্তানের মতামত শুনে,

*ভুল থাকলে বুঝিয়ে সংশোধন করে,

*আর নিজের ভুল থাকলে তা স্বীকার করতে দ্বিধা করে না।

ইসলামে অহংকার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। পিতা-মাতা যদি সন্তানের সামনে ভুল স্বীকার করতে পারে, তাহলে সন্তান সত্যবাদিতা, বিনয় ও ন্যায়পরায়ণতা শিখে।

৪. সমালোচনা গ্রহণ না করার নেতিবাচক প্রভাব

যে পিতা-মাতা সমালোচনা গ্রহণ করতে পারে না, তাদের মধ্যে—

*বাড়তি রাগ,

*দোষারোপ,

*ভুল থেকে শিক্ষা না নেওয়া,

*পরিবারে ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি
ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

সন্তানও তখন নিজের কথা বলতে ভয় পায়, মানসিক দূরত্ব তৈরি হয় এবং যোগাযোগ ভেঙে পড়ে। এই ভাঙন ভবিষ্যৎ পরিবারিক সমস্যার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫. ইসলামী পরিবারে পরামর্শ (শুরা) ব্যবস্থার গুরুত্ব

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন—

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।”
(সূরা আশ-শূরা: ৩৮)

স্ত্রী–স্বামী,সন্তান মিলে পরিবারও এক ধরনের ক্ষুদ্র সমাজ।
সকলের মতামত গুরুত্ব দিয়ে শোনা—এটাই ইসলামী আদর্শ।

সমালোচনা গ্রহণ করার মানসিকতা পরিবারে শান্তি, সহযোগিতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

৬. আদর্শ পিতা-মাতার করণীয়

১. ধৈর্যসহকারে শোনা:
সন্তানের অভিযোগ, মতামত বা পরামর্শ শুনতে হবে।

২. রাগ নিয়ন্ত্রণ:
রাগের অবস্থায় সমালোচনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তাই মুহূর্তিক উত্তেজনা পরিহার জরুরি।

৩. সংশোধনের মনোভাব:
নিজের ভুল স্বীকার করা শক্তির লক্ষণ, দুর্বলতার নয়।

৪. বিনয়ের সাথে আচরণ:
সন্তান ও পরিবারের সদস্যরা যেন পিতা-মাতার কাছে পরামর্শ দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

৫. অনুভূতির প্রতি সম্মান:
সন্তানের অভিমতকে মনোযোগ দিয়ে শোনা তার ভিতরে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে।

মাতা পিতার দায়িত্ব ও সন্তানের হক

নিজ সন্তানের উত্তম তরবিয়ত ও উত্তম শিক্ষা দান প্রত্যেক পিতা মাতার একান্ত জরুরি। ইসলামে সন্তান প্রতিপালনকে শুধু দায়িত্ব নয় এবং ইবাদতে অভিহিত করা হয়েছে।এর দ্বারা মৃত্যুর পরও পিতা-মাতা নিরিবিচ্ছিন্নভাবে উপকৃত হতে পারে, নিম্নে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও হক সম্পর্কিত কিছু হাদিস দেওয়া হল:

وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث صَدَقَة جَارِيَة أَو علم يِنْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَه
رَوَاهُ مُسلم وَغَيره

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন: বনী আদমের মৃত্যুর পর তার তিনটি আমল ব্যতীত (যাবতীয়) আমল বন্ধ হয়ে যায়। তা হলঃ (১) সাদকায়ে জারিয়া, (২) উপাদেয় ইলম এবং (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।
(ইমাম মুসলিম প্রমুখ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

মৃত্যুর পর নতুন নতুন নেকী লাভের তৃতীয় উপায় হল- أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه (এবং নেককার সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে)। কারও নেককার সন্তান যা-কিছু নেক আমল করে, তাতে সে নিজে যে ছাওয়াব পায় তার সমপরিমাণ ছাওয়াব তার পিতা- মাতাও পেয়ে থাকে। কারণ তার নেককার হওয়াটা পিতা-মাতার সুশিক্ষা ও তরবিয়াতের ফলেই সম্ভব হয়। কাজেই প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত তাদের সন্তান-সন্ততিকে উত্তম তরবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নেককাররূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করা। এ হাদীছে বলা হয়েছে, নেককার সন্তান পিতা-মাতার জন্য যে দু'আ করে, পিতা-মায় তা দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে অপর এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَك

‘নিশ্চয়ই জান্নাতে কোনও কোনও ব্যক্তির মর্যাদা উঁচু করা হবে। আর তাতে সে ব্যক্তি বলবে, এটা কীভাবে হল? তখন বলা হবে, (এটা হয়েছে) তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তিগফারের মাধ্যমে’।(সুনানে ইবন মাজাহ: ৩৬৬০; মুসান্নাফে ইবন আবী শায়বা: ১২০৮১; তাবারানী, আল মু'জামুল আওসাত: ৫১০৮)

এ হাদীছে যদিও দু'আ-ইস্তিগফারের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সদাকায়ে জারিয়া ও উপকারী শিক্ষার বিষয়কে এর সঙ্গে যুক্ত করা হলে বোঝা যায়, পিতা-মাতা কেবল সন্তানের দু'আ-

ইস্তিগফার দ্বারাই উপকৃত হবে না, তাদের যাবতীয় সৎকর্ম দ্বারাও তারা উপকার লাভ করবে। তা দ্বারা সন্তান নিজে যেমন ছাওয়াব পাবে, সমপরিমাণ ছাওয়াব তাদের পিতা-মাতার আমলনামায়ও লেখা হবে।

সন্তানের শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠন

সন্তানের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান উপহার হলো ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

“কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচারের চেয়ে উত্তম কিছু দান করতে পারে না।” (তিরমিযী: ১৯৫২)

আদর্শ পিতা-মাতা সন্তানকে শুধু দুনিয়াবি জ্ঞানেই নয়, বরং ঈমান, নামায, আমানতদারিতা, সততা ও আল্লাহভীতি শেখাতে সচেষ্ট হন। এভাবেই গড়ে উঠে এক ইসলামী আদর্শ পরিবার।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ نَاصِحٍ، عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . وَنَاصِحٌ هُوَ ابْنُ الْعَلاَءِ كُوفِيٌّ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالْقَوِيِّ وَلاَ يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَنَاصِحٌ شَيْخٌ آخَرُ بَصْرِيٌّ يَرْوِي عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا.

কুতায়বা (রাহঃ) .... জারির ইবনে সামুরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া এক সা‘ পরিমাণ বস্তু সাদ্‌কা করা অপেক্ষা ভাল।

—জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫১ (আন্তর্জাতিক নং ১৯৫১)

শিশু জন্মের পর;আযান দেওয়া

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনু আবি রাফি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র হাসান

রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রসব করলেন, এখন রাসুল ﷺ কে তার কানে সালাতের আযানের ন্যায় আযান দিতে দেখেছি।

শিশু জন্মের পর;তাহনিক করা

আসমা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি তার পেটে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ধারন করলেন। তিনি বলেন, আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি আসন্ন প্রসবা। (সন্তান যেকোনো সময় হয়ে যেতে পারে) আমি মদিনায় এসে কুবায় অবতরণ করি। এ কুবাতেই আমি তাকে (পুত্র সন্তানটি) প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ র কাছে এসে তার কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনালেন, এবং তা চিবিয়ে তার মুখে থুথু দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি আব্দুল্লাহর পেটে গেল, তা হলো নবি ﷺ এর থুথু। নবী ﷺ সামান্য চিবানো খেজুর নবজাতকের মুখের ভেতরের তালুর অংশে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তার জন্য দোয়া করলেন এবং বরকত চাইলেন (বরকতের দোয়া করলেন)

শিশু জন্মের পর;আকিকা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْعَقِيقَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ . - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيث. ِ

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার (রাহঃ) .... আবু রাফি’ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রাযিঃ) যখন হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ)-কে প্রসব করলেন, তখন হাসান (রাযিঃ)-এর কানে নামাযের আযানের মত আযান দিতে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখেছি।

ইমাম আবু ঈসা (রাহঃ) বলেন, এই হাদীসটি হাসান-সহীহ। এর উপর আমল রয়েছে। নবী (ﷺ) থেকে আকীকার বিষয়ে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ছেলের জন্য দু’টো সমবয়সের ছাগল আর মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকীকা দিতে হবে। নবী (ﷺ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ)-এর জন্য একটি ছাগল আকীকা দিয়েছিলেন। কতক আলিম এ হাদীসের মর্মানুসারে মত পোষণ করেছেন।

—জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ১৫১৪ (আন্তর্জাতিক নং ১৫১৪)

শিশু জন্মের পর; সুন্দর নাম রাখা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,সাহাবারা বললেন,হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমরা পিতা মাতার হক জানি, সন্তানের হক কি?

তিনি বললেন, (সন্তানের অধিকার মানে, অভিভাবকের কাছে সন্তানের প্রাপ্য) অভিভাবক তার সুন্দর নাম রাখবে, এবং সঠিক তরবিয়ত শিক্ষা দিবে।

—বায়হাকি)

কন্যা সন্তান লালন পালন পালনের ফজিলত

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে তাদের সবালক না হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করে সে আর আমি জান্নাতে প্রবেশ করব এভাবে, এই বলে বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আজিজ তার শাহাদাত ও মধ্যমা এই দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন। তারপর বললেন, দুটি কাজ এমন যার শাস্তি মানুষ দুনিয়াতে নগদ পেয়ে যায় ক. জুলুম খ. আত্মীয়তা ছিন্ন করা।

মহানবী করিম ﷺ দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। একটি মেয়েদের লালন পালন করার ফজিলত সম্পর্কে ।কি বিশাল ফযিলতের কথা বলা হয়েছে যে ,যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে লালন পালন করবে সে মহানবি ﷺ এর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তা এমন পাশাপাশি যে দুটি আঙ্গুল যেভাবে পাশাপাশি থাকে ঠিক সেই রকম।

কিছু দান করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا. فَقَالَ " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ". قَالَ لاَ. قَالَ " فَارْجِعْهُ." ُ

আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রাহঃ) .... নু’মান ইবনে বাশীর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট হাযির হলেন এবং বললেন, আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন (তিনি) নবী (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সব ছেলেকেই

কি তুমি এরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না (তা করিনি)? তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফেরত নাও।

—সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪১৫ (আন্তর্জাতিক নং ২৫৮৬)

সঠিক সময়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা

আবু সাইদ এবং ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার সন্তান হয়, সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, সে সন্তান বালেগ হলে বিয়ে করিয়ে দেবে। যদি সে বালেগ হওয়ার পর অভিভাবক তাকে বিয়ে না করায়, আর সন্তান যদি (বিয়ে না করানোর কারণে) কোন (জৈবিক) গুনাহ করে তাহলে তার গুনাহ পিতার উপরও বর্তাবে।

সৎ কাজের আদেশ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالاَ مَا تَرَكَ الْغُلاَمُ بَعْدَ الْعَشْرِ مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَبْرَةُ هُوَ ابْنُ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ وَيُقَالَ هُوَ ابْنُ عَوْسَجَةَ .

আলী ইবনে হুজর (রাহঃ) ..... সাবরা (রাহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, সাত বৎসর হলে শিশুদের নামায শিক্ষা দিবে আর দশ বৎসরের হলে এই বিষয়ে (প্রয়োজনবোধে) প্রহার করবে।

হাদীসের ব্যাখ্যা:

হাদীছটিতে হুকুম করা হয়েছে, ছেলেমেয়ে যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন তাদেরকে নামায শেখাতে হবে। বলাবাহুল্য নামায পড়তে হলে ওযূ করা শিখতে হয়, সতর ঢাকা জানতে হয়, পাক-পবিত্রতা বুঝতে হয়, কিবলা চিনতে হয় ইত্যাদি। কাজেই নামায পড়ার হুকুম দিতে হলে এসব বিষয়ও তাদেরকে শেখাতে হবে। নামাযে সূরা ফাতিহাসহ অন্য

সূরাও পড়তে হয়, বিভিন্ন দুআ, দুরূদ, আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদিও পড়ার প্রয়োজন হয়। কাজেই তাদেরকে এগুলোও শেখানো জরুরি হবে।

আবার নামায পড়তে হয় আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে। না পড়লে আখেরাতে শাস্তি পেতে হবে। পড়লে জান্নাত লাভ হবে। কাজেই শিশুকে দিয়ে নামায পড়াতে হলে তাদেরকে এসব বিশ্বাসের সঙ্গেও পরিচিত করার প্রয়োজন আছে।

নামায আমাদের দীনের সর্বপ্রধান ইবাদত। এর বাইরেও তিনটি মৌলিক ইবাদত আছে। নামাযের কথা বললে 'দীন'-এর বিষয়টি আপনিই এসে যায়। অতএব তাদেরকে দীনেরও পরিচয় দিতে হবে বৈকি। অপরিহার্যভাবেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাও এসে যায়। এভাবে তিনি যে আমাদের নবী এবং তিনিই সর্বশেষ নবী, তাও তাদের শিক্ষার মধ্যে এসে যাবে।

দেখা যাচ্ছে এক নামায শেখাতে গেলে পর্যায়ক্রমে গোটা দীনের শিক্ষাই শিশুদেরকে দেওয়া হয়ে যায়। শুনতে কথাগুলো খুব ভারী মনে হয়। তা যাতে ভারী মনে না হয়, তাই হিকমতওয়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংক্ষিপ্ত হুকুম দিয়ে দিয়েছেন যে, ব্যস তাদেরকে নামাযের হুকুম দাও। তাঁর এ হুকুম পালন করা হলে বাকি সব একের পর এক এমনিই শেখানো হয়ে যাবে।

এ নির্দেশ দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অভিভাবককে তাদের শিশুসন্তানদের দীনের তালীম দেওয়ারই তাগিদ করলেন। বস্তুত শৈশবে দীনের তালীম দেওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটা এক সাধারণ ও তুচ্ছ কাজ। তুচ্ছ নয় মোটেই, প্রকৃতপক্ষে এর কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। এটা ইমারত নির্মাণের ভিত্তিস্বরূপ। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায় মাটির নিচে অহেতুক টাকা ঢালা হচ্ছে। কিন্তু আসলেই কি টাকা নষ্ট করা হয়? ভালো ইমারত নির্মাণের বিষয়টি তো এরই উপর নির্ভরশীল। ভিত্তি যত মজবুত হবে, তার উপর গড়ে তোলা ইমারতও তত সুদৃঢ় হবে। ঠিক এরকমই শৈশবে ভালোভাবে দীনী শিক্ষা দেওয়ার উপরই প্রকৃত ইসলামী জীবন নির্ভর করে। শৈশবের দীনী তা'লীমের উপর ভিত্তি করেই কাউকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। প্রত্যেক অভিভাবকের বিষয়টিকে অতি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে যত বেশি কুরআনী মক্তব গড়ে তোলা যাবে, উম্মতের কল্যাণ ততই ত্বরান্বিত হবে।

তারপর বলা হয়েছে— (শিশুদের বয়স দশ বছর হয়ে গেলে নামাযের জন্য তাদেরকে মারবে)। অর্থাৎ হুকুম দেওয়া ও বোঝানো সত্ত্বেও যদি তারা নামায না পড়ে, তবে তাদেরকে লঘু শাস্তিদান করবে। অন্যান্য হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এমনভাবে মারতে হবে, যাতে শরীরে দাগ না পড়ে যায়, আর চেহারায় তো মারা যাবেই না।

দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য শাস্তিদানের হুকুম দ্বারা বোঝা যায় শিশুদেরকে এ বয়সের ভেতর দীনের জরুরি ও বুনিয়াদী শিক্ষা দিয়ে ফেলা চাই। দীনের জরুরি বিষয়াবলীর মধ্যে নামায অন্যতম। কাজেই এ বয়সের মধ্যে নামাযও পুরোপুরি শিখিয়ে দিতে হবে।

হাদীছ থেকে শিক্ষণীয়ঃ

ক. শিশুর বয়স সাত বছর হলে নামাযের প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ একটু একটু করে দীনের জরুরি বিষয়সমূহের শিক্ষাদান শুরু করা উচিত।

খ. দশ বছর বয়স হয়ে গেলে নামায ও দীনের অন্যান্য জরুরি বিষয়সমূহ যেন মোটামুটিভাবে শিখে ফেলে, সেরকম করে তার তালীমের ব্যবস্থা নেওয়া চাই।

গ. শিশুর বয়স দশ বছর হলে তাকে দীনদাররূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে লঘু শাস্তিদানের অবকাশ আছে। শাস্তিদানে বাড়াবাড়ি যেমন অন্যায়, তেমনি লঘু শাস্তির প্রয়োজন বোধ হওয়া সত্ত্বেও তা না দেওয়াটাও ক্ষতিকর।

রেফারেন্স: ব্যাখ্যা সূত্রঃ_ রিয়াযুস সালিহীন (অনুবাদ- মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম হাফি.)

—জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ৪০৭ (আন্তর্জাতিক নং ৪০৭)

মৃত্যুর সময় ভালো অবস্থায় রেখে যাওয়া

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا. فَقَالَ " أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ". قَالَ لاَ. قَالَ " فَارْجِعْه." ُ

আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (রাহঃ) .... নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট হাযির হলেন এবং বললেন, আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। তখন (তিনি) নবী (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না (তা করিনি)? তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফেরত নাও।

—সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪১৫ (আন্তর্জাতিক নং ২৫৮৬)

শারীরিক পরিচর্যা:

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি পর্যায়ের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। শিশু মানবসমাজের ভবিষ্যৎ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দানকৃত মূল্যবান আমানত, তাই তাদের সঠিক লালন–পালন ও পরিচর্যা করা পিতা–মাতার দায়িত্ব এবং ঈমানি কর্তব্য।

শিশু হলো পরিবারের বরকত, সমাজের সম্পদ ও উম্মাহর ভবিষ্যৎ। পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা, চিকিৎসা, ব্যায়াম এবং শিষ্টাচার—এসব ইসলামের দৃষ্টিতে সুন্নাহসম্মত পরিচর্যার অংশ। শিশুকে সুস্থভাবে লালন-পালন করা কেবল অভিভাবকের দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহর সামনে জবাবদিহিমূলক আমানত।

১. সঠিক পুষ্টি প্রদান

কুরআনের নির্দেশ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ...

"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর স্তন্যদান করবে..."

— সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৩৩

এই আয়াতে নবজাতকের জন্মের পর তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং দুধপান করানোর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

২. পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি

হাদীসের শিক্ষা

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

"পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।"

— সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২২৩

শিশুর শরীর, পোশাক, বিছানা ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা কেবল স্বাস্থ্যগত নয়, ঈমানেরও দাবি,তাই সচেতন মা বাবার উচিত শিশুকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং এতে অভ্যস্ত করে তোলা।

৩. নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা

হাদীসের নির্দেশনা

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"কোনো ক্ষতি করা বৈধ নয় এবং ক্ষতির প্রতিদানও বৈধ নয়।"
— সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস: ২৩৪০

এই নির্দেশনা শুধু সামাজিক জীবনে নয়, শিশুদের শারীরিক নিরাপত্তা রক্ষাতেও প্রযোজ্য।

৪. বিশ্রাম ও ঘুমের গুরুত্ব

কুরআনের উল্লেখ

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

"আমি তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রাম স্বরূপ।"
— সূরা আন-নাবা, আয়াত ৯

শিশুর যথেষ্ট ঘুম ও শান্ত পরিবেশ দেহের কোষ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও স্নায়ুর বিকাশে অত্যন্ত কার্যকর, ঘুমের সময় নির্বাচনেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এর প্রতি খেয়াল রাখা।

৫. শারীরিক ব্যায়াম ও দক্ষতা বৃদ্ধি

বিভিন্ন হাদীসে সাঁতার, তিরন্দাজি ও ঘোড়ায় চড়ার শিক্ষা দেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যা দেহকে সুস্থ, কর্মক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম আবু রাফি থেকে বর্ণিত: তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সন্তানের জন্য আমাদের যেমন কর্তব্য আছে, তেমন কর্তব্য কি সন্তানেরও আছে?(সহজ কথায় আমরা সন্তানদের উপর যেমন অধিকার পাই তারাও কি আমাদের কাছে তেমন অধিকার পায়?)
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ ,পিতার জন্য কর্তব্য হলো, সন্তানকে লেখা শেখানো, সাঁতার কাটা শেখানো, তীরন্দাজ এবং উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া।

৬. চিকিৎসা গ্রহণ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা

হাদীস

حمَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءًً

"আল্লাহ কোনো রোগ দেননি, কিন্তু তার জন্য চিকিৎসাও দিয়েছেন।"
— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫৬৭৮

ইসলাম চিকিৎসা গ্রহণকে সুন্নাহ নির্দেশ করেছে, তাই শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।

৭. পিতা-মাতার দায়িত্বের সাধারণ নির্দেশ

কুরআনের সামগ্রিক দায়িত্ব

حيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।"
— সূরা আত-তাহরীম, আয়াত ৬

পরিবারকে রক্ষা করার মধ্যে রয়েছে — ঈমান, শিক্ষা, আদব, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও সব ধরনের কল্যাণমূলক পদক্ষেপ।

মানসিক পরিচর্যা:

শিশু-কিশোরদের সামনে বা তাদের সাথে কথাবার্তা ও আচার-আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয় বরং ভালো প্রতিক্রিয়া হয়। মনে রাখতে হবে শিশু অবুঝ হলেও, তারা কোন কথা ও আচরণ পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পারলেও তার ভালো বা মন্দ প্রতিক্রিয়া তার মনে পড়বে এবং তার মন-মানসিকতা গঠনে সেটা ভূমিকা রাখবে। শিশুর মন ভিডিও-এর ন্যায়, যা কিছুই তার সামনে বলা হবে বা করা হবে তার একটা চিত্র শিশুর মনে অঙ্কিত হয়ে যাবে। যদিও সে এখন তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন সে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে তখন দেখা যাবে শিশু কালে যেসব চিত্র তার মনে অঙ্কিত হয়েছিল এখন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। তাই শিশুর সামনে অবলিলায় সবকিছু করা যাবে না বরং এমন সব কিছুই তার সামনে বলতে বা করতে হবে যাতে তার মন মানসিকতা ভালো এবং উন্নত হয়ে ওঠে।

তাই এ বিষয়ে সচেতন থাকতে নিম্নে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

***শিশুদের সব দাবি পূরণ করতে নেই আবার তাদের কোন দাবি যদি পূরণ করানো হয় তাহলে তাদের মন ছোট হয়ে যাবে এবং তারা সংকীর্ণ মানসিকতার অধিকারী হবে।

***অবাধ্য ও দুশ্চরিত্র শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে না দেওয়া। অন্যথায় তাদের চরিত্রের কুপ্রভাব ওদের মনে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই শিশুদের খেলার সাথে নির্বাচনের বিষয়ে সতর্ক থাকা।

***ছেলেদের কে মেয়েদের সঙ্গে একত্রে খেলাধুলা করতে না দেওয়া,এতে তাদের মধ্যে মেয়েলীপনা বা পর্দাহীনতার মনোভাব দেখা দিতে পারে।

***শিশুদেরকে বাঘের ভয় শেয়ালের ভয় ভূতের ভয় ইত্যাদি না দেখানো, না হলে তারা ভীরু প্রকৃতির হয়ে যেতে পারে।

***শিশুরা অন্যায় করলে আল্লাহর ভয় দেখানো, জাহান্নামের আজাবের ভয় দেখানো।তাহলে তাদের মনে খোদাভীরুতা সৃষ্টি হবে আর তাদের অন্যায় কাজে বাঁধা না দিলে অন্যায়কে তারা নেয় বলে ভাবতে শিখবে।

***ভালো কাজের জন্য আল্লাহর খুশি হওয়ার কথা এবং জান্নাতের নেয়ামত লাভের কথা শোনালে তাদের মনে পরকালের চিন্তা গড়ে উঠতে সহায়ক হবে।

***প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ সবকিছুই দেখেন জানেন এ বিষয়টা তাদের সঙ্গে তুলে ধরলে তাদের মধ্যে খোদামুখি চেতনা গড়ে উঠবে।

***শিশুদেরকে নেককার লোকদের কাহিনী শোনালে তাদের মধ্যে নেককার হওয়ার চেতনা সৃষ্টি হবে এবং বীর বাহাদুরের কাহিনী শোনালে তাদের মধ্যে বীরত্বের মনোভাব জাগ্রত হবে।

***শিশুদেরকে অভ্যস্ত করানো যাতে তারা বড়দের ছাড়া কারো নিকট কিছু না চায়, কিংবা কেউ কিছু দিলে বড়দের অনুমতি ব্যতীত যেন গ্রহণ না করে, এরূপ না করলে তাদের মনে লোভ লালসা জন্ম দেবে।

***গরীব মিসকিনকে দান করতে হলে শিশুদের হাত দ্বারা সেটা দেওয়ানো তাহলে শিশুদের মধ্যে দানশীলতা সৃষ্টি হবে।

***শিশুদেরকে কোন খাবার দিলে তারা যেন সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে সকলে মিলে খায়– এরূপ অভ্যস্ত করে তোলা, তাহলে তাদের মধ্যে স্বার্থপরতার মানব সৃষ্টি হবে না।

***শিশুদের জন্য আদর্শ শিক্ষক নির্বাচন করা, তাহলে তারা আদর্শবান হওয়ার চেতনা লাভ করবে।

***সুরা ভালো কাজ করলে বা ভালো লেখাপড়া করলে তাদেরকে সামান্য পুরস্কার প্রদান করা এবং সাবাশি প্রদান করা, তাহলে ভালো কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ সৃষ্টি হবে। এর বিপরীত মন্দ কাজ করলে অবস্থা অনুযায়ী সামান্য তিরস্কার ও সামান্য শাস্তি প্রদান করা। তাদের তাহলে তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, এটা মন্দ। তবে মনে রাখতে হবে খুব বেশি সাবাশি দেওয়া বা খুব বেশি পুরস্কৃত করা ঠিক নয়, তাহলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। পক্ষান্তরে খুব বেশি শাস্তি দিলে তারা খিঁটখিটে বা জেদী হয়ে যেতে পারে বা বেশি তিরস্কৃত করলে নিজের ব্যাপারে তার অনাস্থা জাগতে পারে। বস্তুত: সাবাশি বা পুরস্কার দান, কিংবা তিরস্কার ও শাস্তি প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক– এ ব্যাপারে খুব বিবেচনা সহকারে মেপে মেপে পদক্ষেপ নিতে হবে।

ঈমানী চেতনা:

সন্তানের ঈমান বিকাশে পিতা মাতার দায়িত্ব কত গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে হলে ফিতরাতের ব্যাপারে ইলম থাকা জরুরি। সকল ধরনের বিকৃতি থেকে সুরক্ষিত রেখে ফিতরাত অনুসারে শিশুকে বড় করা, পরিচর্যা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। জন্মের পর শিশুকে আল্লাহ ও ইসলাম সম্পর্কে পরিচিত করার মাধ্যমে এটা অর্জন সম্ভব। নবজাতক প্রথম যে কথা শুনবে সেটা হবে 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!' এভাবে শিশুর জীবনকে করতে হবে আল্লাহর স্মরণে পরিপূর্ণ ।শিশু যেন প্রতিনিয়ত তার পিতা-মাতাকে সালাত আদায় করতে দেখে ,কুরআন তিলাওয়াত করতে শোনে, এবং দৈনন্দিন কথাবার্তায় বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ,ইত্যাদি শব্দগুলো বলতে শোনে।শিশুকে ইসলামের উপর বড় করার লক্ষ্যে পিতা-মাতাকে সকল ধরনের অবাধ্যতা ও গুনাহের কাজ পরিহার করতে হবে। যদি এরকম একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় তাহলে শিশু ঈমান ও তাকওয়া সহকারে বেড়ে উঠবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মুজাহাদা (সংগ্রাম) করবে। এভাবে শিশুর আচার-আচরণ ও চিন্তায় খুব সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের বিকাশ ঘটবে।বীজ বপন করার পর যেভাবে সূর্যের আলো ও বৃষ্টির প্রয়োজন হয় তেমনিভাবে শিশুর ফিতরাতে বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ পিতা-মাতাকেই প্রদান করতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে শিশুর অন্তরে বপনকৃত ফিতরাতের বীজ অঙ্কুরোদগম ঘটে একটি মহিরুহে পরিণত হবে। পিতা মাতার দায়িত্ব হল দরদি মালীর ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে পরিচর্যা করতে থাকা! আল্লাহর দ্বীনের দিকে শিশুর চেহারাকে অভিমুখী রাখা পিতা-মাতার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব।পরিবেশের প্রভাবে যেন সেই কচি চারা গাছটি নষ্ট না হয় যায়! আল্লাহ আমাদেরকে নির্দিষ্ট প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সফলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রদান করেছেন। অঙ্কুরিত বীজের মতো স্বাভাবিকভাবেই আপনার সন্তানের ঈমান বেড়ে উঠবে। ফিত্তরাতের ভিত্তির উপর ঈমানের কাঠামো নির্মাণ করা যে এক চমৎকার স্বাচ্ছন্দ অভিজ্ঞতা!

ঈমানের রুকন সমূহের সাথে শিশুর সম্পর্ক স্থাপনের কাজ জন্ম থেকে শুরু হয় মৃত্যু পর্যন্ত চলমান থাকে। এর জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রোগ্রাম বা কোর্সের প্রয়োজন হয় না। দৈনন্দিন জীবনের সাধারন ঘটনা, পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে ঈমানের রুকনসমূহের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বস্তুত এটাই হলো সন্তান প্রতিপালনের কেন্দ্রীয় বিষয়।

কথায় সত্যবাদিতা:

রসুল ﷺ দুষ্টুমি ছলে হলেও কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না।
আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদের (ছোটদের) সাথে মিশতেন, এমনকি আমার ছোট ভাইটিকে তিনি কৌতুক করে বলতেন, হে আবু উমাইর, কি করেছে নুগাইর(ছোট পোষা পাখি)
–তিরমিযি)
আব্দুল্লাহ ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূল ﷺ আমার ঘরে বসা অবস্থায় আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, এই যে, এসো! তোমাকে দিবো। রাসূল ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তাকে কি দেওয়ার ইচ্ছা করেছো? তিনি বললেন, খেজুর। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে, তাহলে এ কারণে তোমার আমল নামায় একটি মিথ্যার পাপ লিপিবদ্ধ করা হতো।
–আবু দাউদ)
কুরআনের আলোকে নির্দেশনা:

দায়িত্বশীল বাবা-মা মাত্রই সন্তানকে নিয়ে চিন্তা করেন। সন্তানের জন্যে দায়িত্বশীল পিতা-মাতার এই চিন্তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি নন্দিত। কেবল নন্দিত নয় শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তানের সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে চিন্তা-ভাবনা ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ পিতা-মাতার অনিবার্য দায়িত্ব।
মুসলিম সন্তানের জীবনের বিভাগ দু’টি : দ্বীনী জীবন ও পার্থিব জীবন। পার্থিব জীবন নিয়ে চিন্তা তো প্রায় সবাই করে থাকে। কিন্তু দ্বীনী জীবনের ক্ষেত্রে অনেকের মাঝে অবহেলা লক্ষ্য করা যায়।
সন্তানের দ্বীনী ও দুনিয়াবি উভয় জীবন সুন্দর করার লক্ষ্যে পিতা-মাতার কী কী দায়িত্ব ও করণীয় তা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। সংক্ষিপ্ত এই প্রবন্ধে যার সুযোগ নেই। কিন্তু এটুকু কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে সঠিক উৎস থেকে জ্ঞানলাভ অতঃপর যথাযথ চর্চা-অনুশীলন ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তার সঠিক প্রয়োগ খুবই জরুরি। গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধির অভাবে মানুষ যে বড় বড় বিষয়গুলোতে অবহেলার শিকার হয় এই বিষয়টি তার অন্যতম।
সন্তানের সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে পিতা-মাতার করণীয় একটি বিষয়ে হেদায়াত আছে কুরআন মাজীদের সূরা কাহফে। সেই হেদায়াত নিয়েই আজকের আলোচনা। কুরআন মজীদ আমাদেরকে একজন ‘মহান পিতা’র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। যিনি নিজ সন্তানদের

দেখাশোনা করার তেমন সুযোগ পাননি। কারণ তার সন্তনরা বড় হওয়ার আগেই তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তিনি যখন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তখন তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর পক্ষে সন্তানদের বেশি দূর এগিয়ে দিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তিনি এমন এক কীর্তির অধিকারী ছিলেন যা সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য জামিন হয়ে যায়।

কুরআন মজীদে খাযির আলাইহিস সালামের সঙ্গে মুসা আলাইহিস সালামের সফরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেই ঘটনায় আছে, চলতে চলতে একসময় খাযির আলাইহিস সালাম ও মুসা আলাইহিস সালামের প্রচণ্ড খিদে পেয়ে যায়। তাই এক জনপদে পৌঁছে তারা সেই জনপদবাসীকে মেহমানদারির অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা মেহমানদারি করতে অস্বীকৃতি জানায়। এমন ক্ষুধার্ত দু'জন লোককে খাবার দিতে অস্বীকৃতি জানানো ছিল অমানবিকতা।

তারা সামনে চলতে থাকেন। পথিমধ্যে দেখতে পান, জনপদের একটি প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ছে। খাযির আলাইহিস সালাম প্রাচীরটি ঠিকঠাক করে দেন।

জনপদবাসীর অমানবিক আচরণের কারণে মুসা আলাইহিস সালাম একটু রুষ্ট ছিলেন, বিনা তলবে প্রাচীর ঠিক করতে দেখে তিনি বললেন, আপনি চাইলে প্রাচীর ঠিক করার বদলে এদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। অর্থাৎ এরা তো এমনিতে ভদ্র ও মানবিক নয়। ক্ষুধার্ত মানুষকেও খাবার দিতে রাজি হয় না। তাই পারিশ্রমিক বাবদ এদের কাছ থেকে কিছু নেওয়া যেত।

খাযির আলাইহিস সালাম তখন মুসা আলাইহিস সালামকে জানালেন, এই প্রাচীর জনপদবাসীর কল্যাণে ঠিক করা হয়নি। তা করা হয়েছে দুই এতিম বালকের জন্য! তিনি তা নিজের মর্জিতেও করেননি। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে এই প্রাচীর ঠিক করার আদেশ করেছেন!

দুই এতিম বালক কোত্থেকে এল? এই প্রাচীর ঠিক করার সাথে তাদের কী সম্পর্ক? কেন আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই প্রাচীর ঠিক করার নির্দেশ দিলেন? এই সব প্রশ্নের জবাব শুনুন খাযির আলাইহিস সালামের জবানিতে-

وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ. ٠

আর প্রাচীরটি ছিল এই শহরে বসবাসকারী দুই এতিম বালকের। এর নিচে তাদের গুপ্তধন ছিল। আর তাদের পিতা ছিল নেক লোক। সুতরাং আপনার প্রতিপালক চেয়েছেন, ছেলে

দু’টো যেন প্রাপ্তবয়সে উপনীত হয় এবং তাদের গুপ্তধন বের করে নিতে পারে। -সূরা কাহফ (১৮) : ৮২

প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছার আগে প্রাচীর ভেঙ্গে পড়লে অন্যরা গুপ্তধন নিয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তাআলা খাযির আলাইহিস সালামকে প্রাচীর ঠিক করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বালকদ্বয়ের পিতা ধনসম্পদ তো সঞ্চয় করেছিলেন কিন্তু সন্তানদের প্রতিপালন করার সুযোগ তিনি পাননি। তাদের হাতে সম্পদ বুঝিয়েও দিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু তার মাঝে একটি বিশেষ গুণ ছিল। ব্যক্তি জীবনে তিনি নেককার ছিলেন। তাই তাঁর অবর্তমানে খোদ আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর সন্তানদের সম্পদের যিম্মাদারি নিয়েছেন, হেফাযতের ব্যবস্থা করেছেন।

এ ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই, সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যত বিনির্মাণে অন্যতম করণীয় হল, খোদ বাবা-মা নেককার হওয়া। পিতা-মাতা সত্যিকারার্থে নেককার হলে তাদের অবর্তমানেও আল্লাহ তাআলা সন্তান-সন্ততির দেখভালের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

এ ঘটনা থেকে আমরা এও বুঝতে পারি, আগত প্রজন্মের জন্য যথাযথ নিয়ম মেনে সম্পদ সঞ্চয় করা জায়েয। কিন্তু পার্থিব সম্পদ আগত প্রজন্মের জন্য আসল সম্পদ নয়। আসল সম্পদ হল, নেককাজ। নেককাজ এমন এক ধন, যার সুফল কেবল নেককারগণই ভোগ করেন না, বরং পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত এর সুফল ভোগ করে। এমনকি কখনো তা পরবতী প্রজন্মের পার্থিব ধনসম্পদের সুরক্ষা পর্যন্ত নিশ্চিত করে।

আল্লাহ তাআলার রহম ও করুণার ধারা বর্ষিত হোক কুরআনে উল্লেখকৃত সেই ‘মহান পিতা’র প্রতি যিনি আপন নেককাজ দিয়ে সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের পথ সুগম করার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের। আপনিই তাওফীকের মালিক হে আল্লাহ

হযরত লুকমান আলাইহিস সালামের উপদেশ

يٰبُنَيَّ اِنَّهَاۤ اِنۡ تَکُ مِثۡقَالَ حَبَّۃٍ مِّنۡ خَرۡدَلٍ فَتَکُنۡ فِیۡ صَخۡرَۃٍ اَوۡ فِی السَّمٰوٰتِ اَوۡ فِی الۡاَرۡضِ یَاۡتِ بِہَا اللّٰہُ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَطِیۡفٌ خَبِیۡرٌ ﴿۱۶﴾

(লুকমান আরও বলেন) হে বাছা! কোন কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোন পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন। **১১**

—লুকমান - **১৬**

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۚ

বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। **১২**

—লুকমান - **১৭**

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۚ

এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দর্পিত অহংকারীকে পসন্দ করেন না।

—লুকমান - **১৮**

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ٪

অর্থঃ
অর্থঃ নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর **১৩** এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। **১৪** নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর।

তাফসীর (মুফতী তাকী উসমানী)

১৩. অর্থাৎ মানুষের চলার গতি হওয়া উচিত মাঝামাঝি; না এতটা দ্রুত যে, মনে হবে দৌড়াচ্ছে আর না এতটা শ্লথ, যা আলস্যের পর্যায়ে পড়ে। এমনকি যে ব্যক্তি জামাআতে নামায আদায়ে যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও দৌড়াতে নিষেধ করে দিয়েছেন। বলেছেন, সে যেন শান্তভাবে মর্যাদাপূর্ণ গতিতে হেঁটে যায়।
১৪. কণ্ঠস্বর সংযত রাখার অর্থ এ নয় যে, মানুষ অতি ক্ষীণ স্বরে কথা বলবে, যা শ্রোতাকে কষ্ট করে শুনতে হবে। বরং এর অর্থ হল, যাকে শোনানো উদ্দেশ্য, সে শুনতে পায় এতটুকু আওয়াজে কথা বলবে। এর বেশি চিৎকার করবে না। সেটা ইসলামী আদবের খেলাফ।

এমনকি যে ব্যক্তি পাঠ দান করে বা ওয়াজ করে, তার আওয়াজও প্রয়োজনের বেশি উঁচু করা ঠিক নয়। শ্রোতাদেরকে শোনানোর ও বোঝানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই উঁচু করবে। তার বেশি বড় করাকে বুযুর্গগণ এ আয়াতের আলোকে অপছন্দ করেছেন। যারা অপ্রয়োজনে মাইক ব্যবহার করে মানুষকে কষ্ট দেয়, এ আদেশটির প্রতি তাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

তাফসীরে ইবনে কাছীর)

১৬-১৯ নং আয়াতের তাফসীর

এগুলো হযরত লোকমানের অন্যান্য উপদেশ। যেহেতু এগুলো হিকমতে পরিপূর্ণ সেহেতু কুরআন কারীমে এগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, যেন লোকেরা এর উপর আমল করতে পারে। বলা হচ্ছেঃ মন্দ কাজ, যুলুম, ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদি সরষের দানা পরিমাণই হালে না কেন এবং তা যতই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হালে না কেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তা অবশ্যই উপস্থিত করবেন। মীযানে তা ওযন করা হবে এবং তার প্রতিফল দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ (আরবি)অর্থাৎ আমি (কিয়ামতের দিন) ইনসাফের তারাষ্য রেখে দিবো, সুতরাং কোন নফসের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না।" (২১:৪৭) আর এক জায়গায় আছেঃ (আরবি)অর্থাৎ কেউ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও দেখবে।" (৯৯:৭-৮)সেই নেকী অথবা বদী কোন বাড়ীতে, কোন অট্টালিকায়, কোন দূর্গে, কোন পাথরের ফাঁকে, আসমানের উপরে, মাটির নীচে, মোটকথা যেখানেই করা হালে কেন আল্লাহ তা'আলার কাছে তা গোপন থাকে না। আল্লাহ পাক তা পেশ করবেনই। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সকল বিষয়ের খবর রাখেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর কাছে অপ্রকাশিত থাকে না। অন্ধকার রাত্রে পীপিলিকা চলতে। থাকলেও তিনি ওর পায়ের শব্দ শুনতে পান। কেউ কেউ বলেন যে, (আরবি) দ্বারা ঐ পাথরকে বুঝানো হয়েছে যা সাত তবক যমীনের নীচে থাকে। এর কিছু কিছু সনদও সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। যদি এটা সঠিক প্রমাণিত হয় তবে ভাল কথা। সাহাবীদের একটি জামাআত হতেও এটা বর্ণিত আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। খুব সম্ভব যে, এটাও ইসরাঈলী বর্ণনা। কিন্তু তাদের কিতাবসমূহের কোন কথাকে আমরা সত্যও বলতে পারি না, মিথ্যাও না। এটা তো প্রকাশমান যে, ওটা সরিষার দানা পরিমাণ কোন তুচ্ছ ও নগণ্য আমল হালে এবং তা এতো গোপনীয় হালে যে, কোন পাথরের মধ্যে রয়েছে। যেমন হযরত আবু

সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন লোক এমন পাথরের মধ্যেও কোন আমল করে যার কোন দর-জানালা নেই ও কোন ছিদ্রও নেই, তবুও আল্লাহ তা'আলা তা জনগণের সামনে প্রকাশ করে দিবেন, সেই আমল ভালই হালে আর মন্দই হালে। এরপর হযরত লোকমান তাঁর পুত্রকে বলেনঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি নামাযের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ওর ফরয, ওয়াজিব, আরকান, সময় ইত্যাদির পূর্ণ হিফাযত করবে। সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর কথা সকলের নিকট পৌছিয়ে দিবে। প্রত্যেক ভাল কাজের জন্যে সকলকে উৎসাহিত করবে। মন্দ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। যেহেতু ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ এমন একটি বিষয় যা প্রত্যেকের কাছে তিক্ত লাগে, সত্যভাষী লোকদের সাথে সবাই শত্রুতা রাখে, সেই হেতু আল্লাহ তাআলা তাদের দেয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর পথে উন্মুক্ত তরবারীর নীচে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করার সময় অলস হয়ে বসে না পড়া খুব বড় বাহাদুরীর কাজ। হযরত লোকমান তাই স্বীয় পুত্রকে এ কাজের উপদেশই দিয়েছেন।এরপর হযরত লোকমান স্বীয় পুত্রকে বলেনঃ অহংকারবশে তুমি মানুষের দিক হতে তোমার মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ো না। তাদেরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান ও নিজেকে বড় মনে করো না। বরং তাদের সাথে সদা সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে।হাদীস শরীফে এসেছেঃ তুমি সমস্ত মুসলিম ভাই-এর সাথে হাসিমুখে মেলামেশা করবে। এটাও তোমার জন্যে বড় একটা পুণ্যের কাজ।"অতঃপর হযরত লোকমান বলেনঃ হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। এমন যেন না হয় যে, তুমি আল্লাহর বান্দাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করবে, তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং গরীব ও মিসকীনদের সাথে কথা বলতে ঘৃণা বোধ করবে। মুখ ঘুরিয়ে কথা বলাও অহংকার।(আরবি) একটা অসুখের নাম। উটের ঘাড়ে ও মাথায় এ অসুখ বেশী প্রকাশ পায়। এ অসুখে ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়। অহংকারী লোকদেরকে এ অসুখের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরব দেশের লোক এই অহংকারের অবস্থাকে (আরবি) বলে থাকে। আর এ শব্দের ব্যবহার তাদের কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে গর্বভরে চলা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। দাম্ভিক ও অহংকারীরা আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে তিনি বলেনঃ (আরবি) অর্থাৎ তুমি দম্ভভরে চলাফেরা করো না, যেহেতু না তুমি যমীনকে ধ্বংস করতে পারবে, পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছতে পারবে।" (১৭:৩৭) এ আয়াতের তাফসীরও যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে একদা অহংকারের উল্লেখ করা হলে তিনি ওর খুবই নিন্দে করলেন এবং বললেন যে, এই রূপ আত্মম্ভরী ও অহংকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা খুবই রাগান্বিত হন। তখন একজন সাহাবী (রাঃ) আরয করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি যখন কাপড় সাফ

করি এবং তা খুব পরিষ্কার হয় তখন আমাকে খুব ভাল লাগে। অনুরূপভাবে ভাল চামড়ার জুতা পায়ে দিলে মন খুব আনন্দিত হয়। লাঠির সুন্দর আচ্ছাদনীও মনে আনন্দ দেয়। (তাহলে এটা কি অহংকার হবে)?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ না, এটা অহংকার নয়। বরং অহংকার ওরই নাম যে, তুমি সত্যকে ঘৃণা করবে ও লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে।. এ রিওয়াইয়াতটি অন্য ধারায় খুব লম্বাভাবেও বর্ণিত আছে এবং তাতে হযরত সাবিত (রাঃ)-এর ইন্তেকাল ও তার অসিয়তের কথাও বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ হযরত লোকমানের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলেনঃ তুমি মধ্যম চালে চলবে। খুব ধীরে ধীরেও না এবং খুব ডিং মেরে ও দম্ভভরেও না। আর কথা বলার সময় খুব বড়াবাড়ী করবে না। অযথা খুব চীঙ্কার করে কথা বলবে না। জেনে রাখবে যে, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। এই খারাপ দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অকারণে চীৎকার করা ও উঁট-ডপট করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ মন্দ দৃষ্টান্তের যোগ্য আমরা নই। যে নিজের জিনিস দান করে ফিরিয়ে নেয় তার উপমা হলো ঐ কুকুর যে বমি করে ঐ বমি চাটতে থাকে।এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে তখন শয়তান হতে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা, সে শয়তানকে দেখতে পায়। (এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন) অন্য একটি রিওয়াইয়াতে রাত্রির কথা উল্লেখ আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।হযরত লোকমান হাকীমের এ উপদেশগুলো অত্যন্ত উপকারী ও লাভজনক বলেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে এগুলো বর্ণনা করেছেন। তার আরো বহু জ্ঞানগর্ব উক্তি ও উপদেশ বর্ণিত আছে। নমুনা ও নিয়ম-রীতি হিসেবে আমরাও অল্পকিছু বর্ণনা করছিঃ হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, লোকমান হাকীম বলেছেনঃ যখন আল্লাহকে কোন জিনিস সপে দেয়া হয় তখন তিনি ওর হিফাযত করে থাকেন।" (এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে)হযরত কাসিম ইবনে মুখাইমারাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত লোকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে বলেনঃ হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি (আরবি) হতে বেঁচে থাকো, কেননা এটা রাতের বেলায় ভীতিপ্রদ এবং দিনের বেলায় নিন্দনীয় জিনিসি।" (এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন)হযরত লোকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে আরো বলেনঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! নিশ্চয়ই হিকমত বা প্রজ্ঞা মিসকীনদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দেয়।" (এটাও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন)আউন ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে বলেনঃ হে আমার প্রিয় বৎস! যখন তুমি কোন মজলিসে হাযির হবে তখন ইসলামী রীতি অনুযায়ী সালাম করবে। তারপর মজলিসের এক দিকে বসে পড়বে। অন্যেরা কিছু না

বললে তুমিও কিছু বলবে না, বরং নীরব থাকবে। মজলিসের লোকেরা যদি আল্লাহর যিকরে মশগুল হয়ে যায় তবে তুমি তাতে সবচেয়ে বড় অংশ নেয়ার চেষ্টা করবে। আর যদি তারা বাজে গল্প শুরু করে দেয় তবে তুমি ঐ মজলিস ছেড়ে চলে আসবে।" এটাও মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে।হাফস ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত লোকমান একটি সরিষাপূর্ণ থলে নিজের পার্শ্বে রেখে তার ছেলেকে উপদেশ দিতে শুরু করেন। প্রত্যেকটি উপদেশের পর তিনি একটি করে সরিষা থলে হতে বের করতে থাকেন। অবশেষে থলে শূন্য হয়ে পড়ে। তখন তিনি তার ছেলেকে বলেনঃ হে আমার প্রিয় পুত্র! যদি আমি এই উপদেশগুলো কোন পাহাড়কে করতাম তবে পাহাড় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো।" শেষ পর্যন্ত তাঁর পুত্রেরও এ অবস্থাই হয়। (ইবনে আবি হাতিম (রঃ)-ই এটা বর্ণনা করেছেন)হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা হাবশীদেরকে গ্রহণ করে নাও। কেননা, তাদের তিনজন জান্নাতবাসীদের নেতা। তারা হলো- লোকমান হাকীম (রঃ), নাজ্জাশী (রঃ)। এবং মুআযিন বিলাল (রাঃ)।" (এ হাদীসটি আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

সাহাবায়ে কেরামের সন্তানদের ঈমানী চেতনা

নবীন ও অল্প বয়স্ক বাচ্চাদের মধ্যে যে দ্বীনি প্রেরণা ছিল তা মূলত: অভিভাবকদের প্রতিপালনের ফল ছিল। পিতা-মাতা এবং অন্যান্য অভিভাবকগণ যদি বাচ্চাদের আদর -স্নেহে নষ্ট না করে প্রথম হতেই তাদের দ্বীনি অবস্থার খোঁজখবর রাখেন এবং তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন তবে দ্বীনি বিষয় সমূহ শিশুদের অন্তরে বসে যাবে এবং বড় হয়ে ঐসব বিষয় তাদের জন্য অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা উহার বিপরীত বাচ্চা মনে করে তাদের প্রত্যেক মন্দ কাজকে এড়িয়ে যাই এমনকি অত্যাধিক মহব্বতের কারণে তাতে খুশি হই আর দিনের ব্যাপারে যত ত্রুটি বিচ্যুতি দেখি নিজের মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেই যে, বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অথচ যে বীজ শুরুতে বপন করা হয়েছে বড় হয়ে আরও পরিপক্ক হয়ে যায় আপনি ছোলার বীজ বপন করে উহা হতে গম উৎপন্ন করতে চান তা অসম্ভব। আপনি যদি চান যে, বাচ্চাদের মধ্যে ভালো অভ্যাস ও চরিত্র সৃষ্টি হোক, দ্বীনের প্রতি তারা যত্নবান হোক, এবং দ্বীনদার হোক, তবে বাচ্চা বয়সেই তাদেরকে দিনের প্রতি যত্নবান হওয়ার অভ্যস্ত করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণ শৈশব কাল হতেই নিজ সন্তানদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং দ্বীনি কাজের অভ্যাস করাতেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতকালে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আনা হলো। সে রমাদান মাসে মদ পান করেছিল এবং রোজাও রেখেছিল না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন তোর ধ্বংস হোক আমাদের তো বাচ্চারাও রোজা রাখে।

–হেকায়েতে সাহাবা)

হযরত আঈশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস বর্ণনা ও আয়াত অবতীর্ণ হওয়া:

হযরত আঈশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছয় বছর বয়সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মক্কা মুকাররমায় বিবাহ হয় এবং নয় বছর বয়সে মদিনা তাইয়েবায় স্বামীগৃহে গমন করেন। অতঃপর ১৮ বছর বয়সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়। ১৮ বছর বয়সী বা কি! কিন্তু এই বয়সেও এত বেশি দ্বীনি মাসায়েল এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও আমলসমূহ তাহার নিকট থেকে বর্ণনা করা হয় যার কোন সীমা নেই। মাসরূক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি বড় বড় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমদেরকে দেখিয়াছি হযরত আঈশা রাদিআল্লাহু আনহার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন,আতা রহিমাহুল্লাহ বলেন, হযরত আঈশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা মাসায়েল সম্পর্কে পুরুষদের চেয়েও বেশি অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ছিলেন।

হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,আমরা কোন ইলমি সমস্যার সম্মুখীন হলে হযরত আঈশা রাঃ নিকট যেয়ে তার সমাধান পেতাম।

হাদীস গ্রন্থে তার নিকট থেকে বর্ণিত দুইহাজার দুইশত হাদিস পাওয়া যায়।

তিনি নিজে বলেন, আমি মক্কা মুকাররমায় শৈশবকালে খেলতেছিলাম। ওই সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সূরা ক্বমারের এই আয়াত নাজিল হয়—

بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر.

হযরত আঈশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আট বছর বয়স পর্যন্ত মক্কায় থেকেছেন ।এত অল্প বয়সে ওই আয়াত নাজিল হওয়ার বিষয় জানা তারপর আবার মুখস্ত রাখা দ্বীনের সহিত বিশেষ সম্পর্ক থাকার দরুনই সম্ভব হতে পারে। নচেৎ ৮ বছর বয়সই বা কতটুকু!!

—হেকায়াতে সাহাবা)

হযরত উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বদরের যুদ্ধে আত্মগোপন:

হযরত ওমর ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন অল্প বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। শুরুতেই মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী সাদ ইবনে আবু বক্কর রাদিআল্লাহু আনহুর ভাই ছিলেন। হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার ভাই উমাইরকে বদরের যুদ্ধের সময় দেখলাম যখন লশকর রওনা হওয়ার প্রস্তুতি চলতে ছিল তখন সে এদিক ওদিক লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাতে কেউ দেখে না ফেলে। এটা দেখে আমি আশ্চর্যনিত হলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? লুকিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? সে বললো আমার আশঙ্কা হচ্ছে

যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে ফেলবেন এবং ছোট মনে করে জেহাদে যেতে নিষেধ করে দিবেন, ফলে আমি যেতে পারব না। আকাঙ্ক্ষা যে, আমি অবশ্যই যুদ্ধে শরিক হব। তো আল্লাহ তা'আলা আমাকেও কোন প্রকারে শাহাদাতের সুযোগ দান করবেন। অবশেষে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে দৈন্যদল উপস্থিত হল তখন সে যে বিষয়ের আশঙ্কা ছিল তাই দেখা দিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু প্রবল আগ্রহের কারণে সহ্য করতে পারলেন না, কাঁদতে লাগলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আগ্রহ ও ক্রন্দনের কথা জানতে পেরে অনুমতি দিয়ে দিলেন। যুদ্ধে শরিক হলেন এবং দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হল। ওই যুদ্ধে শহীদ হলেন। তার ভাই সাদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তার ছোট হওয়ার এবং তরবারি বড় হওয়ার কারণে আমি উহার ফিতায় বারবার গিরা লাগিয়ে দিতাম যাহাতে তরবারি উচা হয়ে যায়।

—হেকায়াতে সাহাবা)

কুরআনের কারণে হযরত যায়েদ রাদিআল্লাহু আনহু এর অগ্রগণ্য হওয়া:

হিজরতের সময় হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স এগারো বছর ছিল। তিনি ছয় বছর বয়সে এতিম হয়ে গিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে স্বেচ্ছায় নিজেকে পেশ করেন কিন্তু অনুমতি মিলে নাই। পুনরায় ওহুদের যুদ্ধে বের হলেন। কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়া হল। কেহ কেহ বলেন যে যেহেতু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রাফে রাদিআল্লাহু আনহুম উভয়েরই অনুমতি হয়েছিল এ কারণে তাদের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর হতে প্রত্যেক যুদ্ধেই শরিক হতে থাকেন। তবুকের যুদ্ধে বনু মালিকের ঝাণ্ডা হযরত উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হতে ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নিয়ে হযরত জায়েদ রাদিআল্লাহু আনহুকে দিলেন। উমারা রাদিয়াল্লাহু আনহু চিন্তিত হলেন, সম্ভবত: আমার দ্বারা কোন ক্রটি হয়ে গিয়েছে অথবা কোন অসন্তুষ্টির কারণ ঘটেছে। তিনি আরজ করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ!! আমার ব্যাপারে আপনার কাছে কোন অভিযোগ এসেছে কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন না ব্যাপার এটা না। বরং যায়েদ তোমার চেয়ে কোরআন শরীফ বেশি পড়েছে। কোরআন তাকে ঝাণ্ডাবহনে অগ্রগণ্য করে দিয়েছে।

—হেকায়াতে সাহাবা)

আকাবিরদের তারবিয়্যাত কেমন ছিল

ইসলামের ইতিহাসে “আকাবির” বা “আদর্শ বরণীয় পূর্বসূরি” বলতে মূলত সেই সকল আলেম, মুহাদ্দিস, ফুকাহা, মুজতাহিদ, সুফিয়া ও দ্বীনের মেহনতকারীদের বোঝানো হয়,

যাদের জ্ঞান, ঈমান, আমল, তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা, ইনসাফ, দায়িত্ববোধ এবং উম্মাহর প্রতি ত্যাগ-তিতিক্ষা যুগে যুগে দিকনির্দেশনার আলোকবর্তিকা হয়ে আছে। তাঁদের জীবন ছিল কেবল সিদ্দিকী ও নববী শিক্ষা ধারণের ব্যাখ্যা নয়—বরং তা ছিল প্রকৃত তারবিয়্যাতের জীবন্ত মডেল।তাদের এই তারবিয়্যাত পদ্ধতির ফলেই উম্মাহর মাঝে এমন ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছে যারা সত্যবাদিতা, তাকওয়া, আমানতদারী, জুহুদ, ইখলাস, সেবাপরায়ণতা ও নববী চরিত্র-এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি হয়ে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই শুদ্ধ তারবিয়্যাতের আলোচনায় আকাবিরদের জীবনাবলি অধ্যয়ন করা শুধু ঐতিহাসিক স্মৃতি নয়—বরং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চরিত্র গঠনের জন্য অপরিহার্য দিকনির্দেশনা।

হযরত মাওলানা ইয়াহিয়া রাহিমাহুল্লাহ এর তরবিয়তের বিস্ময়কর ঘটনাবলী:

হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ শিশু কলিজার টুকরাকে যেভাবে আদব ও আখলাকের সাথে গড়ে তুলেছিলেন এবং পদে পদে স্বীয় সন্তানকে যে বিধি নিষেধের আওতায় লালন পালন করেছিলেন তার নজির আজকের যুগে খুঁজে পাওয়া বড়ই দুষ্কর। এই ব্যতিক্রমী তরবিয়ত ও শাসনের কারনেই হয়তো তিনি শাইখুল হাদিস হিসেবে দুনিয়াব্যাপী খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন এবং যুগের স্বর্ণ মন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। অধ্যাবসায় ছাড়া কোন কিছুই অর্জিত হয় না। সন্তানকে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার পরিকল্পনা ও ত্যাগ না থাকলে সন্তানকে মনের মত করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেবের তরবিয়তি সেসব ঘটনাবলী থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই। তাই সেসব ঘটনায় একটু বিশদভাবেই তুলে ধরছি।

শাইখুল হাদিস সাহেব রহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে আল ইতিদিল নামক কিতাবে লেখেন "আমার প্রাথমিক তরবিয়ত ও লালন পালন যে নীতির ভিত্তিতে হয়েছিল তা হল, ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত আমার কারো সাথে কথা বলার অনুমতি ছিল না। এবং আব্বাজান কিংবা চাচাজান ছাড়া আর কারও সাথে কোথাও যাওয়ার অনুমতি ছিল না। এমনকি মাদ্রাসার ক্লাসেও"। দুইজন শিক্ষক ছাড়া আর কারও নিকট পড়ার অনুমতি ছিল না। আব্বাজান কিংবা চাচাজান ছাড়া মুরুব্বী ও শায়েখ হযরত খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহঃ এর মজলিসে যাওয়ারও অনুমতি ছিল না। কেননা ,আশংকা ছিল এভাবে একা একা ক্লাসে বা হযরতের মজলিসে গেলে হয়তো পাশের লোকের সাথে কথা বলবো। একা একা বাসায় যাওয়ার অনুমতি ছিল না। এমনকি জামাতের সাথে নামাজ আদায়ও বিশেষ কয়েকজনের নেগরানীতে করতে হতো। সে সময়ের আত্মজীবনী শুনলে আলিফ-লায়লার মত হবে। কতো কঠোরতা আমার সাথে করা হয়েছে এবং কেমন বন্দী জীবন আমাকে যাপন করতে হয়েছে তা কল্পনাতীত। কিন্তু

আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শুকরিয়া যে, তার মেহেরবানীতে আমি সেসব ঘাটি পারি দিতে সক্ষম হয়েছি। আর তারই বরকতে আজ দুনিয়া আমার হাতের মুঠোয়।
ওলিয়ে কামেল নামক গ্রন্থে তার বরাত দিয়ে লেখা হয়েছে "এটাতো আমার জন্য সম্ভবই ছিল না যে, আমি কাউকে সালাম করি। আগের ওয়াক্তের নামাজে যার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম পরের ওয়াক্তেও যদি তার পাশে দাঁড়াতাম তাহলে খবর হয়ে যেত। এজন্য এমন কোন ঘটনা ঘটলে আমি নামাজ ছেড়ে অন্য জায়গায় যেয়ে দাঁড়াতাম। কেউ যদি আমাকে আগে সালাম করতো তাহলে কঠিন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হতো যে লোকটি কে? তার সাথে তোমার কি সম্পর্ক?

হযরত উমর পালনপুরী রহিমাহুল্লাহ এর তরবিয়ত

আর মাতৃভূমি পালনপুর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে গাঠামন গ্রামে, বাবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মুম্বাই শহরে থাকতেন। বাবার নাম ছিল ওয়াজিরুদ্দিন। তার জন্ম মুম্বাই শহরে ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে রবিবার দিবাগত রাত বারোটার দিকে। অর্থাৎ সোমবার রাতে। নাম রাখা হয় মোহাম্মদ ওমর। সাত বছর বয়সে তাকে মুম্বাই হানাফিয়া স্কুলে ভর্তি করা হয়। আট বছর বয়সেই তিনি এতিম হয়ে যান। পরিবারের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে চরম আর্থিক অনটনে দিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু আল্লাহ যাকে দিতে চান কুদরতিভাবেই তার সবকিছু সুবিন্যস্ত করে দেন। মমতাময়ী মা-ই হলেন তার শিক্ষা দীক্ষার যোগান দাতা।
মহল্লায় মারইয়াম নামে তার এক খালা থাকতেন। তিনি একজন আল্লাহভীরু, এবাদতগুজার, ও পুন্যবতী মহিলা ছিলেন। মিশকাত শরীফ পর্যন্ত দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তিনি। মাওলানার আম্মা মারইয়াম খালার সংশ্রবে থাকতেন এবং তার কাছ থেকে দীনি ও ঈমানী কথাবার্তা শুনতেন। যে কারণে অসম্ভব রকমের আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহর ভয় ভীতি অন্তরে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তায় নিজের ছেলেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন এবং সেজন্য যান প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছিলেন। মাওলানা বলতেন, সম্মানিত মাতা যদিও লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু আমার ব্যাপারে তার এই আশা ছিল যে, আমি যেন আলেম হই। তিনি আরো বলতেন আম্মাজানকে তো কুরআন আমিই পড়িয়েছি কিন্তু এই কুরআনের উপর আমল করতে তিনি আমাকে শিখিয়েছেন। প্রতিদিন তিনি কোন না কোন ঈমানী কথা শুনাতেন। শৈশবেই কুরআনে বর্ণিত নবী আলাইহিমুস সালামদের ঘটনা মা আমাকে শুনাতেন এবং কেয়ামতের ভয়াবহ আজাবের কথা বলে ভয় দেখাতেন।
বার আম্মাজান বললেন; কবরে দুইজন ফেরেশতা আসবে এবং তিনটি প্রশ্ন করবে। তারপর তিনটি প্রশ্ন ও উত্তর আমাকে বলে দিলেন। অন্য এক সময় যখন আমাকে কবরের আজাবের ভয় দেখাতে শুরু করলেন। তখন আমি আম্মাজানকে বললাম– আমার ফেরেশতাদের প্রশ্ন

ও উত্তর গুলো মুখস্ত হয়ে গেছে। তখন উত্তরে আম্মাজান বললেন; কবরে চামড়ার মুখ কোন কাজে আসবে না, বরং সেখানে আমলের মুখ উত্তর হবে। অতএব তুমি আমল করো এবং কোনটা হালাল কোনটা হারাম তা আমাকে বলো। কারণ আমি তো মূর্খ আর তুমি সবেমাত্র পড়তে শুরু করেছো আমার আম্মা বলতেন বৎস! গীবত করতে চাইলে আমার গীবত করো। এতে ঘরের আমল ঘরেই থাকবে। তোমার নেকিগুলো আমি পাবো। মাওলানা বলতেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল গীবত থেকে ভয় দেখানো ও তার থেকে বেঁচে থাকা। কেননা মানুষ খুবই অসচেতন ও অসতর্ক। শত্রুর গীবত করে নিজের অর্জিত নেকিগুলো শত্রুকে দিয়ে দেয়। আম্মাজান আরো বলতেন; সদকার দ্বারা বিপদ দূর হয়। দানশীলের হাত সর্বদা উপরে থাকে। মাওলানা যখন শৈশবকালে মায়ের কাছ থেকে দীনি কথা শুনতেন তখন নম্র স্বভাবের হওয়ার কারণে পুরো প্রভাবই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

একবারের একটি ঘটনা, যা মাওলানা নিজেই বয়ান করেছেন; আমার আম্মা কিয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরলেন। আকাশ ভেঙ্গে পড়বে, জমিন হেলে পড়বে ইত্যাদি। একদিন রাতে আমি মেঝেতে বিছানা করে শুয়েছিলাম আর আমার ছোট ভাই চৌকিতে শুয়েছিল্ আমি স্বপ্নে কেয়ামতের দৃশ্য দেখতে শুরু করলাম। ঘটনাক্রমে ছোট ভাই চৌকি থেকে আমার উপর পড়ে গেল। আমি চিৎকার করতে শুরু করলাম যে, কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে! হিসাব দিতে হবে। আম্মাজান বাতি জ্বালিয়ে বলতে লাগলেন, উমর কাঁদছো কেন? তোমার ভাই-ই তো পড়েছে। মাওলানা চোখ বন্ধ করেই কান্না করে যাচ্ছেন আর বলছেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। যেন শৈশব থেকেই আল্লাহর ভয় ও কেয়ামতের ভয় মাওলানার শিরা উপশিরায় স্থান করে নিয়েছিলো।

একবার তার আম্মা খালা মারইয়াম থেকে একটি হাদিস শুনলেন, যে কুরআন শিখবে তার মা-বাবাকে কেয়ামতের ময়দানে নূরের মুকুট পরিধান করানো হবে। এই হাদিস শুনে তিনি কাঁদলেন আর বললেন; বৎস! তুমি কুরআন শরীফ ও বুখারী শরীফ পড়ে নাও। তিনি বললেনস, তাহলে স্কুলের পড়ার কি হবে? মা বললেন, যা হবার হবে। এখন তুমি শুধু ইলমে ইলাহি অর্জন করে নাও।

মহান মায়ের দীক্ষায় বদলে গেল ভাগ্য:

অনেকদিন আগের কথা। বণিকদের একটি কাফেলা বাগদাদ অভিমুখে পথ চলছে। যাকে তার জন্মদাত্রী মা কিছু উপদেশ সহকারে ওই কাফেলার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, যেন আদরের সন্তান নিরাপদে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায় এবং সেখান থেকে দীনি আলম অর্জন করে আল্লাহর বান্দাদেরকে হেদায়েতের আলো দেখাতে পারে।

কাফেলাটি বেশ ভালোভাবেই পথ অতিক্রম করছিল; কিন্ত পথিমধ্যে ডাকাত দল তাদের ওপর আক্রমণ করলো। কাফেলার সদস্যগণ তাদের জান-মাল রক্ষার্থে বিভিন্ন উপায় ও কৌশল অবলম্বন করল; কিন্তু তাদের কোন উদ্যোগই কাজে এলো না। এমনকি তাদের আত্মচিৎকারেও ডাকাতদলের হৃদয়ে কোন রূপ দয়ার উদ্রেক হলো না। তারা কাফিলার প্রতিটি সদস্যকে তন্ন তন্ন করে তালাশ করে যাবতীয় ধন সম্পদ লুটে নিল।

ডাকাত দল যখন তাদের লুণ্ঠনকর্ম শেষে ফিরে যাচ্ছিল তখন অসহায় এক কিশোরের উপর তাদের চোখ পড়লো। দেখল সে ভাবলেশহীন স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো– বলো, তোমার কাছে কি আছে? কিশোর বলল– জি হ্যাঁ,আমার কাছে চল্লিশটি দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) আছে।

ডাকাত: চল্লিশ দিনার আছে!!

(তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, এই পুরাতন কাপড় পড়া দরিদ্র ছেলেটির কাছে এতগুলো অর্থ কোত্থেকে এলো! আর যদি থেকেও থাকে তাহলে কিভাবে অকপটে আমাদের কাছে সত্য স্বীকার করছে! অবাক হয়ে তারা ছেলেটিকে সর্দারের কাছে নিয়ে এলো)

ডাকাত —সরদার! এ ছেলেকে দেখুন সে বলে আমার নিকট চল্লিশ দিনার আছে।

সরদার: মিয়া সাহেব, বাস্তবেই কি তোমার নিকট দিনার আছে?

কিশোর: জি হ্যাঁ, আমার কাছে চল্লিশ দিনার আছে।

সরদার: ঠিক আছে। কোথায় রেখেছ? সর্দার অবাক নেত্রে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল।

কিশোর: জি হ্যাঁ ,আমার কোমরে একটি থলি বাধা আছে। সেখানে আছে ।

সর্দার থলি খুললো। বাস্তবেই চল্লিশ দিনার ছিলো। সর্দার অবাক হলো।বিস্ময়ের ঘোরে ছেলেটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। এরপর বলল, বৎস! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

কিশোর: দ্বীনি ইলম শিখার জন্য বাগদাদ যাচ্ছি।

সরদার: সেখানে তোমার পরিচিত কেউ আছে?

কিশোর :না অচেনা শহর। আমার মা চল্লিশ দিনার দিয়েছিলেন যাতে নিশ্চিন্ত মনে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করতে পারি। অচেনা শহরে আমার প্রয়োজন কে পূরণ করবে আর কেনই বা অন্যের করুনা চেয়ে কাছে হাত পাতবো?

সরদার ভীষণ অবাক ও বিস্ময়ে কিশোরের কথাগুলো শুনছিলো। সে ভাবছিলো, এই কমবয়সী শিশু তার টাকাগুলোর কথা গোপন করলো না কেন? যদি সে নিজ থেকে স্বীকার না করতো তাহলে তো আমাদেরকে কেউ ঘূর্নাক্ষরেও একথা জানতো না যে, হতদরিদ্র এ ছেলেটির কাছে এতগুলো অর্থ লুকায়িত আছে। আর এই ওই ছেলেটিও কেন ভাবল না যে, আমি একটি অচেনা স্থানে যাচ্ছি। সেখানে আমার ভবিষ্যত ও জ্ঞানচর্চার পুরোটাই এ অর্থের উপর

নির্ভর করছে। এরপরও কেনো সে অর্থের বিষয়টি চেপে রাখলো না? শিশুটির সরলতা ও অকপট স্বীকারোক্তি ক্রমে ক্রমে ডাকাত সর্দার কুরে খাচ্ছিলো। জিজ্ঞাসা করলো— বাবা! তুমি এই টাকাগুলোর কথা আমাদের কাছে কেন গোপন করলে না? যদি তুমি নিজ থেকে স্বীকার না করে চেপে যেতে তাহলে তো আমরা কিছুইতেই বুঝতে পারতাম না যে, তোমার কাছে এতগুলো অর্থ আছে!!!

কিশোর বললো: ঘর হতে বের হবার সময় মা আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'বাবা! পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল- প্রতিকূল যেমনই হোক; কখনো মিথ্যা বলবে না' আমি মায়ের সেকথা কিভাবে অমান্য করি!

তার কথাগুলো শুনে সর্দারের ভেতরের মনুষত্ববোধ জাগ্রত হল। সে ভাবতে লাগলো, এই কমবয়সী শিশুটি তার মায়ের এতটাই অনুগত যে, নিজ চোখের সামনে ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দেখেও সে মায়ের নির্দেশ অমান্য করতে রাজি হলো না। অথচ আমরা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের রবের নির্দেশ অমান্য করে চলেছি!

সে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে গলার সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো। তার দিনারগুলো তার হাতে ফিরিয়ে দিলো। কাফেলার অন্যদের টাকাকড়িও ফেরত দিল । এরপর আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হয়ে সাচ্চা মনে তাওবা -ইস্তেগফার করলো।

মহান আল্লাহ তাদের তার দয়ার বিস্তৃত আঁচলে ঠাঁই দিলেন। ইতিহাস বলে ,তারা প্রত্যেকেই পরবর্তীতে আল্লাহর অনেক বড় বুজুর্গে পরিণত হয়েছিলেন। আল্লাহর বান্দাদের সম্পদ লুণ্ঠনকারীরা হয়ে গেল আল্লাহর দ্বীনের দৌলত দা বন্টনকারী। মহান মায়ের দীক্ষা শুধু তার স্নেহের সন্তানকেই বড় করেনি; একটি ডাকাতদলের ভাগ্যের গতিপথও বদলে দিলো। তিনি হলেন সেই মহান প্রতিভাবান ব্যক্তি; যাকে আজকের গোটা বিশ্ব 'আব্দুল কাদের জিলানী রহিমাহুল্লাহ' নামে স্মরণ করে থাকে। আজ যার নাম উচ্চারিত হতেই প্রতিটি অন্তর শ্রদ্ধা ও সম্মানে ঝুঁকে যায়।

আদর ও শাষন; উভয়ের সামঞ্জস্যতা

সন্তান মানবসমাজের এক মূল্যবান আমানত, যার সুশিক্ষা, সু-আচার ও সুন্দর চরিত্র গঠনের দায়িত্ব সর্বপ্রথম পিতা-মাতার উপর ন্যস্ত। শিশুর প্রাকৃতিক বিকাশে স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা যেমন অপরিহার্য, তেমনি তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব, নৈতিকতা ও জীবনদর্শন প্রশিক্ষিত করতে যথাযথ শাসন, দিকনির্দেশনা ও আহরণমূলক নিয়ন্ত্রণও সমানভাবে প্রয়োজন। ভালবাসাহীন শাসন শিশুকে ভয়প্রবণ, বিদ্রোহী ও আত্মগোপন প্রবণ করে তুলতে পারে; অন্যদিকে শাসনহীন আদর শিশুকে বেপরোয়া, দায়িত্বহীন, স্বার্থকেন্দ্রিক, শৃঙ্খলাহীন এবং জীবনের

পরীক্ষায় ব্যর্থ করে দিতে পারে। তাই আদর্শ অভিভাবকত্বের মূলনীতি হলো স্নেহ ও শাসনের পরিমিত ও সময়োপযোগী ভারসাম্য রক্ষা করা, যাতে শিশুর মনে ভালোবাসার নিরাপত্তা, আবার আচরণে শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ একইসাথে গড়ে ওঠে।

ইসলাম এই ভারসাম্যের গুরুত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। কুরআন ও সুন্নাহয় পিতা-মাতাকে সন্তানদের প্রতি রহমত, করুণা, দোয়া ও স্নেহ প্রদর্শনের পাশাপাশি তারবিয়াত, আদব, নীতি-শিক্ষা, হালাল-হারামের জ্ঞান, নিয়ন্ত্রণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের নির্দেশ এসেছে। কেননা জীবন শুধু অনুভূতির সমষ্টি নয়; বরং তাতে রয়েছে দায়িত্ব, জবাবদিহিতা, নীতি ও মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ। তাই সঠিক সময়, সঠিক উপায় ও সঠিক মাত্রায় আদর ও শাসনের সামঞ্জস্য সন্তানের উত্তম চরিত্র, জ্ঞান, মেধা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ঈমানি চেতনা ও সফল ব্যক্তিত্ব গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।
আদরের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম না করা:

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ مِنۡ اَزۡوَاجِكُمۡ وَاَوۡلَادِكُمۡ عَدُوًّا لَّكُمۡ فَاحۡذَرُوۡهُمۡ ۚ وَاِنۡ تَعۡفُوۡا وَتَصۡفَحُوۡا وَتَغۡفِرُوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

অর্থঃ
অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। যদি তোমরা মার্জনা কর ও উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩
সূরা তাগাবুন, আয়াত:১৪

তাফসীর (মুফতী তাকী উসমানী)

৩. যেই স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে উৎসাহিত করে, তারা শত্রুতুল্য। তবে তারা যদি অনুতপ্ত হয় ও তাওবা করে তবে তাদেরকে ক্ষমা করা উচিত এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত [তখন যদি তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করা হয় কিংবা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা ভেস্তে যাবে। যুক্তি-বুদ্ধি ও শরীয়তের বিচারে যতটুকু সম্ভব তাদের নির্বুদ্ধিতাকে উপেক্ষা করা ও তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা চাই। যে ব্যক্তি তাদের প্রতি এরূপ মহানুভবতার পরিচয় দিবে, আল্লাহ

তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন ও তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। প্রকাশ থাকে যে, সব স্ত্রী ও সকল সন্তান-সন্ততিই এ রকম নয়। এমন বহু নারী আছে, যারা তাদের স্বামীদের দীন ও ঈমান হেফাজত করে এবং নেক কাজে তাদের সৎ পরামর্শক ও উত্তম সহযোগী হয়। এমনিভাবে অনেক সৌভাগ্যবান সন্তান রয়েছে, যারা তাদের পিতা-মাতার জন্য স্থায়ী পুণ্য হয়ে থাকে -অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী অবলম্বনে]।

وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَاۤ اَمۡوَالُكُمۡ وَاَوۡلَادُكُمۡ فِتۡنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنۡدَهٗۤ اَجۡرٌ عَظِيۡمٌ ٪

অর্থঃ

অর্থঃ জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। ১৭ আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে।

আল আনফাল, আয়াতঃ ২৮

তাফসীর (মুফতী তাকী উসমানী)

১৭. মাল ও আওলাদের মহব্বত মানুষের মজ্জাগত বিষয়। যৌক্তিক সীমার মধ্যে থাকলে দূষণীয়ও নয়। কিন্তু পরীক্ষা এভাবে যে, এ ভালোবাসা আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে উৎসাহ যোগায় কি না সেটা লক্ষ্য করা হবে। অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালোবাসা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সাথে হলে তা কেবল জায়েযই নয়; বরং এ কারণে সওয়াবও পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে এ ভালোবাসা যদি গুনাহ ও নাফরমানীর দিকে নিয়ে যায়, তবে এটা মহা মুসিবতের কারণ। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিমকে এর থেকে হেফাজত করুন।
হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র। তার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। মসজিদে নববীতে তিনি একবার খুতবা দিচ্ছিলেন।এমন সময় হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু মসজিদে ঢুকলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মিম্বার থেকে নেমে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে কোলে তুলে নিলেন। কখনও কখনও এমন হতো যে, তিনি নামাজ পড়ছেন আর শিশু হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাঁধে চড়ে বসেছেন। তারপর সিজদায় যাওয়ার সময় আস্তে নামিয়ে দিতেন। একবার তিনি তাকে কোলে নিয়ে বলে ওঠেন– এই সন্তানেরা মানুষকে কৃপণ ও ভিরু বানিয়ে দেয়। কেননা তাদের কারণেই মানুষ অনেক সময় আল্লাহর পথে খরচ করে না। কৃপণতা প্রদর্শন করে। কখনো কখনো বুঝদিল হয়ে যায়, পিছুটান থাকার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় যেতে ভয় পায়।

এই প্রিয়পাত্র শিশু হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন অজ্ঞতাবশত সদকার একটি খেজুর মুখে দিলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রশ্রয় দিলেন না। এখন থেকেই তাকে গড়ে তুলতে হবে। তাই সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখ থেকে তা বের করালেন এবং বললেন, এটা আমাদের খাওয়ার জিনিস নয়।

এ হাদিসে ইঙ্গিত করছে যে, শিশুদের তারবিয়াত ছোট ছোট জিনিস থেকেই শুরু করতে হয়। এর দ্বারাই তাদের মন মানসিকতা গড়ে ওঠে। জীবনের প্রকৃত নির্মাণ এভাবেই হয়। এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত।এ সুন্নত এখন বলতে গেলে উঠেই গেছে। চারদিকে আজব দৃশ্য। শিশুদের ভুল ত্রুটি শোধরানোর রেওয়াজ খতম হয়ে গেছে। বাবা-মা এদিকে লক্ষ্যই করে না। আগেও তো বাবা-মা শিশুদের ভালোবাসতো। কিন্তু সে ভালোবাসায় তারা বুদ্ধি-বিবেচনারও প্রয়োগ করত। এখনকার ভালোবাসা বড় লাগামহীন। আদরের দুলাল যা কিছুই করুক। যত বড় ভুলই তাদের দ্বারা হোক বাবা-মা তা ধরছে না বা ধরার প্রয়োজন বোধ করছে না।তারা মনে করে যেহেতু অবুঝ শিশু তাই সাত খুন মাফ। এর ভুল-চুক ধরার ও শোধরানোর কোন প্রয়োজন নেই।

তাই আমরা সতর্ক থাকবো সন্তানের প্রতি যেন অতিরিক্ত আদর যেন আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ও তার দ্বীন থেকে গাফেল না করে দেয়, সীমার ভিতর থেকে সন্তানদের হকের ব্যাপার অধিক সচেতন থাকার পাশাপাশি খেয়াল রাখা যাতে তাদের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগের কারণে আমার ইবাদতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

আজকাল দেখা যায় সন্তানের প্রতি অধিক মনোযোগের কারণে এবাদাতে ঘাটতি চলে আসে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সন্তানের ভবিষ্যতের চিন্তায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারাদিন তাদের পেছনেই খাটতে থাকা, এটা কোনভাবেই আমাদের জন্য কাম্য নয়। পরবর্তীতে দেখা যাবে যাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছি আল্লাহ তাদেরকেই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিবেন। অনেক সময় এই সন্তানরাই পরে বড় হয়ে আর বাবা-মাকে দেখে না। যেই বাবা-মা তাদের জন্য এত কষ্ট করলেন তাদের কষ্টের মূল্য তারা বোঝে না।

তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত আদর ও শাসন কোনটার ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি না করা, এক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা, আল্লাহর হক পুরোপুরি আদায় করা, পাশাপাশি সন্তানের হক আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে তাওফীক দিক আমিন।

অবহেলার ক্ষতিকর প্রভাব:

সন্তানদের উপর পিতামাতার যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি পিতামাতার উপরও সন্তানদের অধিকার রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর; যে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম, কঠোরস্বভাব ফেরেশ্তাগণ, যারা অমান্য করে না যা আল্লাহ্ আদেশ করেন। তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত তাই তারা করে।"[সূরা তাহরীম, ৬৬: ৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের দায়িত্বশীল; তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী; তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে...।"[সহিহ বুখারী (৮৯৩) ও সহিহ মুসলিম (১৮২৯)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "যে বান্দাকে আল্লাহ কোন জনসমষ্টির দায়িত্বশীল বানান; কিন্তু সে যেদিন মৃত্যুবরণ করে সে দিন এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে খেয়ানত করেছে; আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন।"[সহিহ মুসলিম (১৪২)]

এর থেকে জানা গেল যে, পিতামাতার উপর সন্তানদের কিছু অধিকার রয়েছে; সে সকল অধিকার আদায় করা কর্তব্য। সে অধিকারগুলো অনেক; যেমন-

১। স্বামীর উচিত নিজের জন্য উত্তম স্ত্রী বাছাই করা এবং স্ত্রীর উচিত নিজের জন্য উত্তম স্বামী বাছাই করা। পুরুষ তার জন্য এমন একজন স্ত্রী বাছাই করবেন যে নারী ভবিষ্যতে তার সন্তানদের মা হওয়ার উপযুক্ত। আর নারী এমন একজন পুরুষকে বাছাই করবেন যে পুরুষ তার সন্তানদের পিতা হওয়ার উপযুক্ত।

২। সন্তানের সুন্দর একটি নাম রাখা, তার যত্ন নেয়া এবং তার জন্য খাবার-পানীয়, পোশাকাদি ও বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা করা; এক্ষেত্রে কৃপণতা বা অপচয় না করা।

৩। পিতামাতার উপর সন্তানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে— উত্তম প্রতিপালন, তাদের চরিত্র ও আচার-আচরণ গঠনে যত্নবান হওয়া, আল্লাহ্ যেভাবে সন্তুষ্ট হন তারা সে ভাবে দ্বীন পালন করছে কিনা সেটা তদারকি করা এবং তাদের দুনিয়াবী প্রয়োজনগুলোরও খোঁজখবর রাখা; যাতে করে তাদের জন্য উপযুক্ত ও সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করা যায়।

সন্তানদের এ অধিকারের ক্ষেত্রে অনেক পিতামাতাই অবহেলা করেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি নিজেই সন্তানদের মাঝে অবাধ্যতা ও দুর্ব্যবহার টেনে আনেন।

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন:

"যে ব্যক্তি তার সন্তানকে উপকারী শিক্ষা দেয় না, অবহেলায় ছেড়ে দেয় সে তার সন্তানের প্রতি জঘন্যতম অন্যায় করে। অধিকাংশ সন্তান নষ্ট হয় পিতামাতার কারণে, পিতামাতার অবহেলার কারণে এবং সন্তানদেরকে ইসলামের ফরয ও সুন্নত আমলগুলো শিক্ষা না দেয়ার কারণে। এভাবে ছোট বেলায় পিতামাতাই সন্তানদেরকে নষ্ট করে...। এক পর্যায়ে তিনি বলেন: "কত মানুষ নিজেই নিজের সন্তানকে, তার কলিজার টুকরাকে দুনিয়া ও আখিরাতে দুর্ভাগা বানায়; তার প্রতি অবহেলা করা, তাকে শাসন না করা, তাকে ভোগবিলাসে সহযোগিতা করার মাধ্যমে। অথচ সে ব্যক্তি ভাবে যে— সে তাকে খুশি করতেছে; অথচ সে তাকে লাঞ্ছিত করেতেছে। সে ভাবে যে, সে তার প্রতি দয়া করছে; অথচ সে তার প্রতি অন্যায় করছে। এভাবে সে ব্যক্তি সন্তান দিয়ে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং সন্তানকেও দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে...।" এক পর্যায়ে তিনি আরও বলেন: "যদি আপনি সন্তান নষ্ট হওয়ার কারণগুলো দেখেন তবে দেখবেন যে, অধিকাংশ সন্তান নষ্ট হওয়ার কারণ পিতামাতা।"[তুহফাতুল মাওদুদ বি আহকামিল মাওলুদ (পৃষ্ঠা- ২২৯, ২৪২) থেকে সমাপ্ত]

তবে, জেনে রাখা উচিত সন্তান প্রতিপালনে পিতামাতার অবহেলার মানে এটা নয় যে, সন্তানও পিতামাতার অধিকারগুলো আদায়ে অবহেলা করবে এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে। বরং সন্তানদের উপর ফরয পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা। তার প্রতি তাদের দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করে দেওয়া। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "এবং মাতাপিতার প্রতি সদাচারণ" এবং তিনি আরও বলেন: "আর তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে আমার সাথে শির্ক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনে নিবে না। তবে, দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে।"[সূরা লোকমান ৩১:১৫]

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মহা মূল্যবান আমানত। এই আমানতের প্রতি খেয়াল রাখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমরা এদিকে সচেষ্ট থাকবো যেন কোনভাবেই আমাদের দ্বারা তাদের প্রতি অবহেলা না হয় যার কারণে আমাদেরকে আখেরাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতিটি বাবা-মাকে সন্তানের হক আদায় করার তৌফিক নসিব করুন আমিন।

উপসংহার:

আদর্শ সন্তান গড়ে তুলতে পিতা মাতা কে ইসলামী আদর্শে আদর্শবান হওয়া জরুরী।

পিতা-মাতার কর্তব্য;

সন্তানের জন্য বেশি বেশি নেক দোয়া করা।

সন্তানকে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে প্রতিপালন করা।

আদর ও শাষন; উভয়ে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা।

আদরের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম না করা।

শিশুর শারীরিক পরিচর্যা ,মানসিক পরিচর্যার বিষয়ে সচেতন থাকা।

সন্তানকে ঈমানী চেতনা, সত্যবাদিতা ও কুরআনের আলোকে গড়ে তোলা।

তথ্যবহি:

গ্রন্থ তালিকা:

১.আদর্শ সন্তান প্রতিপালনে নানাজী আলী তানতাভী
–আবিদা আলমুআইয়াদ

২.শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা
–ডঃ.আঈশা হামদান

৩.এহইয়াউ উলুমিদ্দিন
–ইমাম গাজ্জালী রহি.

৪.ফাযায়েলে আমল
–মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী রহি.

৫. কুরআন সুন্নাহর আলোকে সন্তানের লালন পালন
–শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকি ওসমানী

৬. শিশুদের প্রতি নবীজির ভালোবাসা।
–মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

৭. শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহ জীবন ও আদর্শ।
–মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী রহি.

৮. মুক্তার চেয়ে দামি।
–মাওলানা ইউনুস পালনপুরি

অনলাইন:

মাসিক আল কাউসার
ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব